জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯ • সংখ্যা-১৯ • বর্ষ-৫

প্রত্যয়
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯ • সংখ্যা-১৯ • বর্ষ-৫

উপদেষ্টা সম্পাদক
জাকির হোসেন

সম্পাদকমন্ডলী
প্রাণেশ চন্দ্র বণিক
ফারমিনা হোসেন
নজরুল ইসলাম

সম্পাদক
ফেরদৌস সালাম

নির্বাহী সম্পাদক
বিদ্যুত খোশনবীশ

প্রচ্ছদ: **মোস্তাফিজ কারিগর**

যোগাযোগ

khoshnobish@burobd.org
01318 230552
01977 220550

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক
বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন(এফ),
সড়ক-১০৪, গুলশান-২,
ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদকীয়

চাই কল্যাণ অর্থনীতি ■ কমাতে হবে ধনী গরীবের আয়ের বৈষম্য

বিশ্বে সবচেয়ে বেশি রক্ত ঝরিয়ে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। এদেশে এমন কোন পরিবার নেই যারা মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। স্বজন হারাতে হয়েছে, বাড়ি ঘর পুড়েছে, বাড়ি ঘর থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে, অসংখ্য নারীকে সম্ভ্রম হারাতে হয়েছে, শিকার হতে হয়েছে পৈশাচিক হত্যা, লুণ্ঠন ও নিগ্রহের। গুটিকয় স্বাধীনতা বিরোধী বাদে মুক্তিযোদ্ধা ও দেশের আপামর জনগণের ত্যাগ ও প্রতিরোধ যুদ্ধে বিজয়ী হয়েই স্বাধীনতা, মানচিত্র, পতাকা ও সংবিধান লাভ করেছি আমরা। পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

এদেশের সংবিধানে কল্যাণ অর্থনীতির সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। ঘোষণা আছে শোষনহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাসহ ধনী গরীবের বৈষম্য নিরসনের। কিন্তু তার বাস্তবায়ন পুরোপুরি না হওয়ায় এই বৈষম্য দিন দিন বাড়ছে। একশ্রেণীর মানুষ অবৈধ উপায়ে অর্জিত টাকার পাহাড় গড়ছে, অন্যদিকে এখনো প্রায় ২২ শতাংশ মানুষ দরিদ্র ও দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করছে। আশার কথা এই হার গত দুই দশক আগে প্রায় ৪৪% শতাংশ ছিলো, এখন তার বেশ উন্নয়ন ঘটেছে। আর এই উন্নয়নে সরকারের নানামুখী উন্নয়ন ও সেফটিনেট কার্যক্রম, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি, প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স ইত্যাদির পাশাপাশি এনজিও এবং এমএফআই প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। এসব প্রতিষ্ঠান গ্রাম ও শহরতলী এলাকায় দরিদ্র ও হত দরিদ্রদের জন্য উৎপাদনমুখী নানা কর্মসূচি ও ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নয়ন অর্থনীতিতে এক নিরব বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতেই বাংলাদেশ আজ অনুন্নত অর্থনীতির মোড়ক ছাড়িয়ে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে এবং মধ্যম ও উন্নত অর্থনীতির দিকে এগিয়ে চলছে।

বর্তমানে এমএফআই প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের কর্মযজ্ঞে দেশে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের ভাগ্যের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এর ফলে, বেড়েছে মাথা পিছু আয়, শিক্ষার হার, গ্রাম জনপদের উন্নয়ন এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানসহ নারীর ক্ষমতায়ন। কমেছে শিশু ও গর্ভকালীন মাতৃ মৃত্যুর হার।

বাংলাদেশের সাংবিধানিক চরিত্র হচ্ছে কল্যাণ রাষ্ট্রের। একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, যেখানে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন ঘটবে। স্থিতিশীল উন্নয়নের স্বার্থেই এর বাস্তবায়ন প্রয়োজন। যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে কল্যাণ অর্থনীতি এবং সমাজে হ্রাস পাবে ধনী গরীবের মধ্যকার আয়ের বৈষম্য। প্রত্যেক নাগরিকই পাবে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও নিরাপদ পানির নিশ্চয়তা।

২০১৫ সালের এপ্রিলে যাত্রা শুরু করে অদ্যাবধি 'প্রত্যয়'-এ শুধু 'বুরো বাংলাদেশ' এর অভ্যন্তরীণ খবরা খবরই প্রকাশিত হতো। বুরো বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালক উন্নয়ন ব্যাক্তিত্ব জাকির হোসেন দীর্ঘদিন থেকেই ভাবছিলেন- দারিদ্র নিরসন এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত যে এনজিও সেক্টর দেশের উন্নয়ন অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে- সেই সেক্টরের একটি মুখপত্র দরকার, যার মাধ্যমে এ খাতের সমস্যা সম্ভাবনাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সংবাদ তুলে ধরা সম্ভব হবে। সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই 'প্রত্যয়'-কে ঢেলে সাজানো হলো। এখন থেকে 'প্রত্যয়'-এ শুধুমাত্র বুরো বাংলাদেশ এর নয়, এনজিও সেক্টরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংবাদও গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করা হবে। স্বাভাবিকভাবেই 'প্রত্যয়' এর জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য সংবাদসহ দায়িত্বশীল প্রবন্ধ/নিবন্ধ প্রত্যাশা করছি।

সকলের জন্যে শুভ কামনা। 'প্রত্যয়' দীর্ঘজীবি হোক।

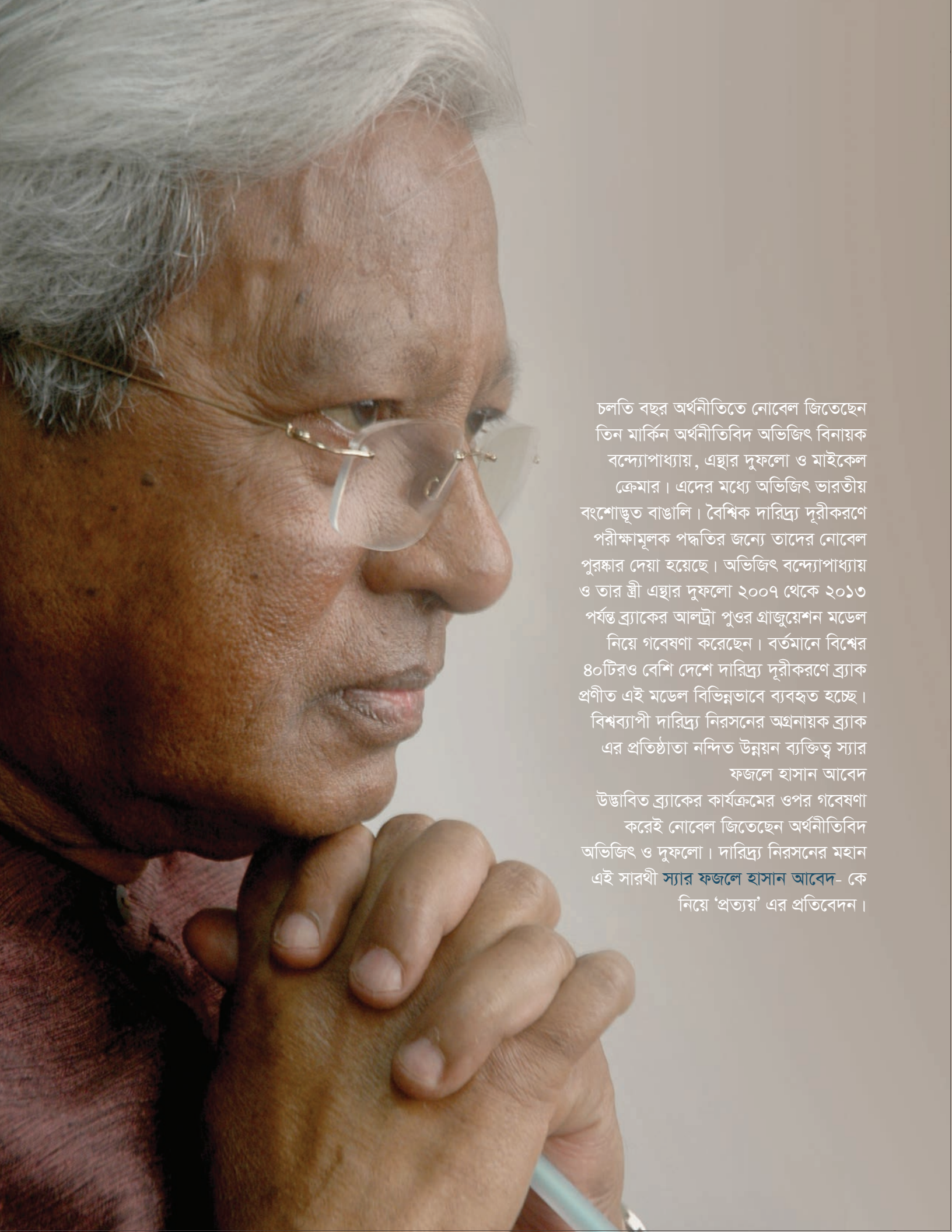

চলতি বছর অর্থনীতিতে নোবেল জিতেছেন তিন মার্কিন অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, এস্থার দুফলো ও মাইকেল ক্রেমার। এদের মধ্যে অভিজিৎ ভারতীয় বংশোদ্ভূত বাঙালি। বৈশ্বিক দারিদ্র্য দূরীকরণে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির জন্যে তাদের নোবেল পুরষ্কার দেয়া হয়েছে। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার স্ত্রী এস্থার দুফলো ২০০৭ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত ব্র্যাকের আলট্রা পুওর গ্রাজুয়েশন মডেল নিয়ে গবেষণা করেছেন। বর্তমানে বিশ্বের ৪০টিরও বেশি দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণে ব্র্যাক প্রণীত এই মডেল বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য নিরসনের অগ্রনায়ক ব্র্যাক এর প্রতিষ্ঠাতা নন্দিত উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব স্যার ফজলে হাসান আবেদ উদ্ভাবিত ব্র্যাকের কার্যক্রমের ওপর গবেষণা করেই নোবেল জিতেছেন অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ ও দুফলো। দারিদ্র্য নিরসনের মহান এই সারথী স্যার ফজলে হাসান আবেদ- কে নিয়ে 'প্রত্যয়' এর প্রতিবেদন।

ব্র্যাকের চেয়ার ইমেরিটাস স্যার ফজলে হাসান আবেদ
কিংবদন্তি উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব

ফেরদৌস সালাম

স্যার ফজলে হাসান আবেদ। বিশ্বের সবচেয়ে বড় এনজিও ব্র্যাক-এর সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান ও কিংবদন্তি উন্নয়ন সংগঠক ব্যক্তিত্ব। বর্তমানে তিনি ব্র্যাকের চেয়ার ইমেরিটাস হিসেবে রয়েছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মানবিক উন্নয়ন চেতনার এই দূরদর্শী মানুষটির জন্ম ১৯৩৬ সালের ২৭ এপ্রিল হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচংয়ের এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত জমিদার পরিবারে। তাঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন দুটি বড় পরগনার মালিক। তাঁর পিতার নাম সিদ্দিক হাসান ও মায়ের নাম সৈয়দা সুফিয়া খাতুন।

স্যার ফজলে হাসান আবেদ এর দাদার নাম খান বাহাদুর রফিকুল হাসান এবং নানার নাম খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন, যিনি অবিভক্ত বাংলার (১৯৪১-১৯৪৭) মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত কৃষিমন্ত্রী, পরে শিক্ষামন্ত্রী।

স্যার ফজলে হাসান আবেদের পিতা সিদ্দিক হাসান হবিগঞ্জের ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার ছিলেন। ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত তিনি হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়েছেন। পরে মেজো চাচা কুমিল্লার জেলা জজের কাছে থেকে পড়াশোনা করেন। চাচা জেলা জজ রাশেদুল হাসান পাবনা বদলি হলে তিনি পাবনা জেলা স্কুল থেকে ১৯৫২ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। মেধাবী ছাত্র ফজলে হাসান আবেদ ১৯৫৪ সালে ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। সে বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিকসে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। এ সময় তাঁর চাচা লন্ডনে পাকিস্তান দূতাবাসের বাণিজ্যসচিব সায়ীদুল হাসানের পরামর্শে ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে স্কটল্যান্ডে গিয়ে গ্লাসগো ইউনিভার্সিটিতে নেভাল অর্কিটেকচারে ভর্তি হন। যখন বুঝতে পারলেন, দেশে ফিরে এই লেখাপড়াটা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না, তখন তিনি আর্কিটেকচার পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। চার বছরের কোর্স, দুই বছর পড়া শেষে কোর্স অসমাপ্ত রেখে ১৯৫৬ সালে লন্ডনে এসে ভর্তি হন অ্যাকাউন্টিং-এ।

কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিংয়ের ওপর চার বছরের প্রফেশনাল কোর্স পাশ করেন ১৯৬২ সালে। ১৯৫৮ সালে তার মা মারা যান, ফলে দেশে ফেরার তাগিদ কমে যায়। প্রথমে লন্ডন, পরে কানাডায়, এরপর নিউ ইয়র্কে চাকরি করেন। এক পর্যায়ে আর বিদেশে থাকতে ইচ্ছে করেনি। ১৯৬৮ সালে দেশে ফেরেন। দেশে তখন গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে মানুষ সোচ্চার। ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে ব্যাপক রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হলো। এ সময় ৭০ সালে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সংঘটিত হলো ভয়ানক ঘূর্ণিঝড়। এতে উপকূলের প্রায় ৩ লাখ লোক মারা যায়।

সে সময় ফজলে হাসান আবেদ ছিলেন বিদেশি 'শেল অয়েল' কোম্পানির হেড অব ফাইন্যান্স। অসহায় মানুষের আর্তনাদ শুনে বিবেকবান এই মানুষটি সাড়া না দিয়ে পারেননি। তিনি ঘূর্ণিঝড়কবলিত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ত্রাণ বিতরণ ও পুনর্বাসনে আত্মনিয়োগ করেন। 'শেল'-এ চাকরি করলেও শেলের পক্ষ থেকে তিনি এই কার্যক্রমে অংশ নেননি। তারা নিজেরা কয়েকজন মিলে "হেলপ" নামে একটি সংগঠন গড়ে তার মাধ্যমে কাজ শুরু করেন। তাঁর সহকর্মীরা হলেন ব্যারিস্টার ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী ও শেলে কর্মরত সহকর্মী কায়সার জামান। এঁরা কাজ শুরুর পর বিদেশি সংস্থাগুলো আসতে থাকে। জার্মানির একটি সংস্থা ত্রাণ কার্য চালানোর জন্য হেলপকে ৩ মিলিয়ন ডাচ মার্ক অনুদান প্রদান করে। এ সময় তাদের সঙ্গে যোগ দেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা আকবর কবির ও নটর ডেম কলেজের শিক্ষক ফাদার টিম। এভাবে স্যার ফজলে হাসান আবেদ তার 'হেলপ' নিয়ে পুরোদমে মনপুরার ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্গঠনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

'৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হলে তিনিও খুব আনন্দিত হন। ভেবেছিলেন পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থায় বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। কিন্তু তারা ক্ষমতা হস্তান্তর না করে উলটো বিজয়ী বাঙালিদের হত্যা নিধন শুরু করল। এর আগে ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবের ভাষণ সমগ্র বাঙালি জাতিকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল।

২৫ মার্চের পর চট্টগ্রাম ও ঢাকার মধ্যে হঠাৎ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ২৬ মার্চ তিনি তার বাসা ছেড়ে চট্টগ্রামের পাহাড়ে এক বন্ধুর বাড়ি চলে যান। ঢাকা ফিরেন ১২ এপ্রিল। ঢাকায় 'শেল'-এর কাজ করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, দলমত-ধর্ম নয়, বাঙালি মাত্রই ওদের শত্রু। ওরা চায় বাঙালিদের ধ্বংস করে ফেলতে। প্রতিদিনই সারা দেশে নিরস্ত্র বাঙালিরা হত্যার শিকার হচ্ছিল। ঘটছিল ধর্ষণসহ নানা অমানবিক অত্যাচার। মে '৭১, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ইংল্যান্ডে চলে যাবেন এবং সেখানে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার জন্য একটি সংগঠন গড়ে তুলবেন। ইংল্যান্ডে যাবার জন্য বিমানে করাচি আসেন। এ সময় ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টিলিজেন্স (আইএসআই) তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। কারণ, শেল-এর চেয়ারম্যান চিঠি লিখেছিলেন, তাদের এক অফিসার পালিয়ে গেছে। আইএসআই তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করেও অভিযোগ করার মতো কিছু পায়নি। তবে তারা প্রশ্ন করেছিল কেন ঢাকা ছেড়েছে। তিন-চার মাস আগে ফজলে হাসান আবেদ প্রমোশন পান, সেই কাগজে তাঁর বেতন উল্লেখ ছিল ৪১০০ টাকা। তারা বলেছিল এত টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ কেন? কী উদ্দেশ্যে? দুদিন পর তাঁর বন্ধু পাকিস্তান সরকারের উপসচিব আসফউদ্দৌলাহ্ (পরে বাংলাদেশ সরকারের সচিব) ব্রিটিশ হাইকমিশনে খবর দিয়ে বলেন যে, তোমাদের এক নাগরিককে আইএসআই আটকে রেখে হয়রানি করছে। ব্রিটিশ হাইকমিশন থেকে বলা হলো, আমাদের নাগরিকের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না থাকলে ছেড়ে দেওয়া হোক, তার পাসপোর্টও ফেরত দেওয়া হোক। দুদিন পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি লন্ডনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে অনেক কষ্ট করে আফগানিস্তানে যান

এবং টেলিগ্রামের মাধ্যমে লন্ডন থেকে সেখানে যাওয়ার টিকিট কাটিয়ে আনেন। পরে কাবুল থেকে ইস্তাম্বুল ও ইস্তাম্বুল থেকে লন্ডনে পৌঁছান।

লন্ডনে তিনি বন্ধুদের নিয়ে গঠন করেন 'অ্যাকশন বাংলাদেশ'। এই সংগঠনটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। এরপর তাঁর উদ্যোগে দেশের সীমান্ত অঞ্চলে সাহায্য পাঠানোর জন্য গড়ে ওঠে 'হেলপ বাংলাদেশ'। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তার চাচা সায়ীদুল হাসানকে পাকিস্তানি সেনারা ধরে নিয়ে যায় এবং হত্যা করে। তাঁরা অ্যাকশন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে লন্ডন টাইমস পত্রিকায় বাংলাদেশে গণহত্যা চলছে এই বিষয়টি তুলে ধরে বড় একটি বিজ্ঞাপন দেন। তিনি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সাথে তহবিল সংগ্রহের কাজও করেন। তিনি ফ্রান্সের প্যারিস ও ডেনমার্কের কোপেনহেগেনেও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত তৈরির উদ্যোগ নেন। রেডিও টিভিতে সাক্ষাৎকার দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তিনি বিদেশিদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি 'অ্যাকশন বাংলাদেশ'-এর পক্ষ থেকে কলকাতায় এসে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রবাসী সরকারের হাতে সংগৃহীত অর্থ প্রদান করেন। জেড ফোর্সের অধিনায়ক জিয়াউর রহমানের অনুরোধে মুক্তিবাহিনীকে একটি দুরবিনও দেন। হেলপ বাংলাদেশ অফিসেই একপাশে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে জায়গা দেন তিনি। মুক্তিযোদ্ধাদের সোয়েটার কেনার জন্যেও হেলপ বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে টাকা পাঠানো হয়। অ্যাকশন বাংলাদেশ ও হেলপ বাংলাদেশ মিলে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে পথনাটক করেন ব্রিটেনে– যা ব্রিটিশ টেলিভিশনে প্রচারিত হয়।

১৬ ডিসেম্বর ৭১, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ফজলে হাসান আবেদ ১৭ জানুয়ারি ৭২-এ দেশে ফিরেন। দেখেন, সারা দেশকেই বিধ্বস্ত করে গিয়েছে পাকিস্তানি সেনারা। সিলেটের শাল্লা এলাকা ছিল হিন্দু অধ্যুষিত। এখানে বেশ কটি গ্রাম প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন প্রথমে শাল্লা এলাকায় পুনর্বাসনের কাজ শুরু করবেন। বিদেশের

স্যার ফজলে হাসান আবেদের জন্মদিনে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন, ডরপ এর প্রধান নির্বাহী এম এ নোমান, আশা'র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ফায়জার রহমান ও এসএআরপিভি-এর প্রধান শহীদুল হক।

মাটিতে মুক্তিযুদ্ধের জন্য কাজ করতে গিয়ে তার নেতৃত্বে 'অ্যাকশন বাংলাদেশ' ও 'হেলপ বাংলাদেশ' গঠিত হয়েছিল। এবার স্বাধীন দেশের দরিদ্র, অসহায়, সব হারানো মানুষের পুনর্বাসনের জন্য তিনি ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে গড়ে তুললেন বাংলাদেশ রিহ্যাবিলেটশন অ্যাসিসট্যান্স কমিটি সংক্ষেপে 'ব্র্যাক'।

ব্র্যাকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারপারসনের দায়িত্ব দেওয়া হয় কবি বেগম সুফিয়া কামালকে। সদস্যরা ছিলেন আকবর কবীর, অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক (পরে জাতীয় অধ্যাপক), সাবেক সচিব কাজী ফজলুর রহমান, ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী, এস আর হোসেন এবং ফজলে হাসান আবেদ -এই সাত জনকে নিয়ে ব্র্যাক-এর নির্বাহী পরিচালনা বোর্ড গঠিত হয় এবং ফজলে হাসান আবেদকে ব্র্যাক-এর নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। দীর্ঘসময় নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালনের পর ২০০১ সালে স্যার ফজলে হাসান আবেদ ব্র্যাক-এর চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব নেন।

এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য ফান্ড প্রয়োজন। কিন্তু কোথায় পাবেন? সে মুহূর্তে ভিকারুল ইসলাম চৌধুরীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে পাওয়া ২৫,০০০ টাকা এবং ফজলে হাসান আবেদের লন্ডনের ফ্ল্যাট বিক্রির ৬৮০০ পাউন্ড দিয়ে ব্র্যাকের প্রথম কার্যক্রম শুরু হয়। অর্থাৎ ব্র্যাকের প্রথম ডোনার ফজলে হাসান আবেদ।

শাল্লায় গিয়ে তারা ১০-১২ জন উচ্চশিক্ষিত তরুণকে দিনপ্রতি ১০ টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জরিপের কাজে লাগান। যারা এসএসসি পাশ তাদের পারিশ্রমিক ছিল দিনে ৫ টাকা। সে সময় অবশ্য এই ১০ টাকা, ৫ টাকা বেশ ভালো মজুরি ছিল। জরিপের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর, লোকজন এবং তারা কী কাজ করত, এখন কী ধরনের কাজ করতে পারবে ইত্যাদি তথ্য উপাত্ত পেয়ে যান। জরিপকারীরা অনেকটা স্বেচ্ছাসেবা মানসিকতা নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে এই জরিপ করেন। শাল্লায় ব্র্যাকের কোনো অফিস ছিল না, কর্মীদের কাগজ-কলম কিনে দেওয়া হয়।

জরিপের তথ্য-উপাত্তসমূহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান ও অর্থনীতি বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক ও কয়েকজন ছাত্রছাত্রী বিশ্লেষণ করে যে রিপোর্ট দেন তারই ভিত্তিতে ফজলে হাসান আবেদ প্রথম প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করেন। ঢাকাতেও ব্র্যাকের নিজস্ব কোনো অফিস ছিল না, ফজলে হাসান আবেদ ব্র্যাকের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য আইনজীবী ভিকারুল ইসলাম চৌধুরীর ৯৫ মতিঝিল অফিসে বসে দাপ্তরিক কাজ করতেন। বলা যায়, এটাই ছিল ব্র্যাকের প্রথম অফিস।

লন্ডনের অক্সফাম জিবি ব্র্যাককে প্রথম ২ লাখ পাউন্ড অর্থ সাহায্য প্রদান করে। ১৪ হাজার ঘর তৈরির জন্য জাপান থেকে টিন আনা হয়। ৬ লক্ষ বাঁশ, বিপুল পরিমাণ কাঠ কুশিয়ারা নদীর জলে ভাসিয়ে আনা হয় আসাম থেকে। সেগুলো দিয়ে বিধ্বস্ত ভিটায় ব্র্যাক নতুন ঘরবাড়ি নির্মাণ করে দেয়। একই সঙ্গে সাহায্য, সেবা, ত্রাণ, পুনর্গঠন, গ্রাম সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রেও ব্র্যাক কাজ করতে থাকে। শাল্লায় ব্র্যাকের কাজ শুরু করতে গিয়ে ফজলে হাসান আবেদকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। ১৭ মাইল পথ হেঁটে গিয়ে শাল্লায় প্রথম রাত কাটিয়েছিলেন বাজারের একটা দোকানে মাচার ওপর। সারা রাত বৃষ্টিতে নিদ্রাহীন ভিজেছিলেন।

ব্র্যাকের কাজ বন্ধ করার জন্য তখনকার সরকার দলীয় এমপিসহ স্থানীয় নেতাদের অনেকেই চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, সরকারই তো পুনর্বাসনের কাজ করছে, ব্র্যাক কেন কাজ করবে। ব্র্যাককে সিআই-এর এজেন্ট হিসেবে উল্লেখ করে তৎকালীন দৈনিক বাংলার বাণী বিশাল প্রতিবেদন ছেপেছিল। পরে ফজলে হাসান আবেদ পত্রিকার সম্পাদক ও আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি শেখ ফজলুল হক মনিকে বোঝাতে সক্ষম হন যে ব্র্যাক সংশ্লিষ্টরা স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছে এবং বর্তমানে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে অংশ নিচ্ছে।

শুরুতে ব্র্যাকের কোনো ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির প্রস্তাবনা ছিল না। পুনর্বাসনের নিমিত্ত তারা প্রায় ৭/৮ শত নৌকা তৈরি করে দিয়েছিলেন জেলেদের। এর মধ্যে জেলেদের একটা গ্রুপ ফজলে হাসান আবেদের কাছে প্রস্তাব রাখে যে, একটা বিল ডাক হবে। তারা যদি বিলটা লিজ নিতে পারে, তবে তাদের অনেক লাভ হবে। এজন্য ১০ হাজার টাকা দরকার। এক বছর পর এই টাকা শোধ করে দেবে বলে তারা জানায়। ব্র্যাক তাদের বিনা সুদে বা সার্ভিস চার্জ ব্যতিরেকেই এই টাকা প্রদান করে। তারা এক বছর পর টাকাটা শোধ করে দেয়। অনেকে ব্যক্তিগতভাবে এসেও ২/৩ হাজার টাকা ঋণ নেন তাদের কাছ থেকে। কেউ ফেরত দেন, কেউ দেননি। এটা ছিল ব্র্যাক এবং একজন ফজলে হাসান আবেদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা।

এরপর ব্র্যাক সিদ্ধান্ত নেয়, এককভাবে নয়, গ্রুপ করে ঋণ দিতে হবে। প্রথমে মহিলাদের গ্রুপ তৈরি করা হয়। একেকটা গ্রুপকে ৩-৫ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়। স্বামীরা বাজার থেকে ধান কিনে আনবেন, মহিলারা চাউল করে তা

বাজারে বিক্রি করবেন। মাসিক কিস্তিতে তারা টাকা শোধ করবেন। ঋণের সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ করা হয় ১০ শতাংশ। এই পদ্ধতিতে ব্র্যাক সার্ভিসচার্জসহ টাকা ফেরত পেতে থাকে। এভাবেই ব্র্যাকের মাধ্যমে বাংলাদেশে মাইক্রোক্রেডিট কার্যক্রম শুরু হয়। শুধু দেশে নয়, বর্তমানে বিশ্বের ৪০ টিরও বেশি দেশে দারিদ্র দূরীকরণে ব্র্যাকের এই মডেল বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই মূল্যায়নে দেখা যায় এ দেশে ব্র্যাক এবং ফজলে হাসান আবেদই মাইক্রোক্রেডিট এর পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব। ১৯৭৪ সালে শুরু করে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ব্র্যাক শুধু গ্রুপ ঋণ দিয়েছে। ১৯৭৬ সাল থেকে তারা একক ঋণ প্রদান শুরু করে। ১৯৭৯ সালে ব্র্যাক 'রুরাল ক্রেডিট অ্যান্ড ট্রেনিং প্রোগ্রাম' (আরসিটিপি) শুরু করে। এই কর্মসূচির জন্য দাতা সংস্থা পাঁচ মিলিয়ন ডলার প্রদান করে। এতে একসঙ্গে ১৮টি থানায় এই প্রোগ্রাম চালু হয়। কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল ঋণদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন। ব্র্যাক হাঁস-মুরগির অসুখের প্রতিষেধক হিসেবে ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। গরু সুস্থ রাখার লক্ষ্যে তিন মাসের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্যারাভেটিনারিয়ান বানানো হয়।

ব্র্যাক দেশ জুড়ে ঘরে ঘরে খাওয়ার স্যালাইন তৈরির শিক্ষা দিয়েছে যা দেশের স্বাস্থ্য খাতে যুগান্তকারী মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। মুরগির টিকাদান এখন প্রতি গ্রামেই লক্ষণীয়। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্র্যাক ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। ব্র্যাক-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠান আড়ং ব্যবসায়িকভাবে বেশ সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

ব্র্যাকের কার্যক্রম পরিদর্শনে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অনেকেই এসেছেন। এর মধ্যে প্রিন্স চার্লস, প্রিন্স করিম আগাখান, প্রফেসর অমর্ত্য সেন, শাবানা আজমি, বিল ক্লিনটন, হিলারি ক্লিনটন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর ও তার স্ত্রী, আইএফসি প্রধান পিটার ওয়াইকি, টনি ব্লেয়ার, চেরি ব্লেয়ারসহ অনেক সরকার প্রধান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

দারিদ্র্য বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নের স্বীকৃতিস্বরূপ ফজলে হাসান আবেদ দেশে বিদেশে অসংখ্য পদক ও সম্মাননা লাভ করেছেন। এর মধ্যে ১৯৮০ সালে র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার, ১৯৯২ সালে ইউনিসেফ মরিস পেট পুরস্কার, ২০০১ সালে ওলফ পামে পুরস্কার, ২০০৩ সালে ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেষ্টার কর্তৃক ডক্টর ইন এডুকেশন, কুইনস ইউনিভার্সিটি কর্তৃক 'ডক্টর অব ল'সহ অসংখ্য পুরস্কার, সম্মাননা ও আন্তর্জাতিক সনদ লাভ করেছেন। বিশ্বখ্যাত মাইক্রোসফট কর্ণধার শীর্ষ ধনী বিল গেটস ও তাঁর স্ত্রী ব্র্যাকের কর্মসূচি দেখতে বাংলাদেশে এসেছিলেন। ব্র্যাক ইতোমধ্যে 'Gates Award for Global Health' পুরস্কার পেয়েছে।

দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ব্র্যাক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। এ পর্যন্ত ব্র্যাকের ঋণ কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ১৫০ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। গ্রাম সংগঠনের সদস্যবৃন্দ প্রায় ৮,০০০ মিলিয়ন টাকা ব্র্যাকে সঞ্চয় হিসেবে রেখেছে। ঋণ আদায়ের হার প্রায় ৯৯ শতাংশ।

ব্র্যাকের অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ও ব্র্যাক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং ব্র্যাক আফগানিস্তানসহ পৃথিবীর ১৩টি দেশে দারিদ্র নিরসনে সরাসরি কাজ করছে। স্যার ফজলে হাসান আবেদ ইতোমধ্যে ব্র্যাক-এর চেয়ারম্যান পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি এখন ব্র্যাকের চেয়ার ইমেরিটাস, যা অনারারি পোস্ট। কার্যত অবসরে গেলেও এই কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব দেশে-বিদেশে রেখে গেছেন বিশাল কর্মযজ্ঞ। যা যুগে যুগে দেশ ও বিদেশে শুধু প্রশংসিতই হবে না, তার চিন্তা-দর্শনকে কাজে লাগিয়ে গড়ে উঠবে আরো অনেক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। আর্থসামাজিক খাতে সূচিত হবে আরো অধিক উন্নয়ন।

- **লেখক**, সম্পাদক, প্রত্যয়

বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়

স্মৃতি অম্লান

জাকির হোসেন

লেখার শুরুটা করতে চাই টাঙ্গাইল জেলার আলোকিত বিদ্যাপীঠ বিন্দুবাসিনী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কের আদিপর্ব দিয়ে। ১৯৬১ সালের আগ পর্যন্ত আমি টাঙ্গাইল শহরের টাউন প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র ছিলাম। বাসা থেকে খুব দূরে নয় স্কুলটি। হাসতে-হাসতে, খেলতে-খেলতে আমি স্কুলে যেতাম, বাড়ি ফিরতাম। বিন্দুবাসিনীতেও তখন প্রাইমারি সেকশন ছিল। আমাদের নিকট-প্রতিবেশী টাঙ্গাইলের বিশিষ্ট সমাজহিতৈষী খন্দকার আব্দুর রউফের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল বেশ নিবিড়। তিনিই ১৯৬১ সালে তাঁর ছেলে খন্দকার আব্দুল আওয়াল রিজভী ও আমাকে বিন্দুবাসিনীর ক্লাস থ্রিতে ভর্তি করিয়ে দেন; রিজভী এখন দেশের একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক। বিন্দুবাসিনীতে এভাবেই আমার শুরু। স্পষ্ট মনে পড়ছে, সে সময় বিন্দুবাসিনী স্কুলের খালের পাশে তিন রুমের একটি টিনের ঘর ছিল। ওখানেই দুটি রুমে ক্লাস থ্রি ও ফোরের ক্লাস হতো। ওই টিনের ঘরে কোনো জানালাতেই গ্রিল ছিল না। ফলে সুযোগ পেলেই আমরা বন্ধুরা জানালা দিয়ে বের হয়ে পেছনের কাঁঠালগাছে বসে আড্ডা দিতাম, আর স্যার আসছেন শুনলেই জানালা দিয়েই ক্লাসে ঢুকে আবারও ভদ্র ছেলের মতো বেঞ্চে বসে পড়তাম। গাছে চড়ে গল্প করার আনন্দ আর স্যার এসে পড়ার ভয়– দুয়ে মিলে দারুণ এক উত্তেজনাপূর্ণ অনুভূতি!

আমি ভাগ্যবান। কারণ ভর্তি হয়েই শিক্ষক হিসেবে যাঁদের পেয়েছিলাম আমার জীবন ও মননকে তারা নানাভাবে পুষ্ট করেছেন। ধীরেন স্যার, ডাক্তার বাবু স্যার, বিএম স্যার, হিরেন্দ্র কুমার স্যার, নগেন স্যার, রিয়াজ স্যার, গফুর স্যার– সে সময় তারা সবাই জুনিয়র ক্লাসে পড়াতেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে আতঙ্কের শিক্ষক ছিলেন বিএম স্যার। তাঁর বেতের জ্বালাময়ী বাড়ির কথা আমার আজও মনে পড়ে। শুধু আমার কেন! আমাদের কারই-বা মনে পড়ে না! তাঁর বেতের বাড়ি খায়নি এমন কি কেউ আছে! আমাদের বন্ধু আশানূর আলম ঢেপু পড়া না পারার জন্য প্রায়ই স্যারের বেতের বাড়ি খেত। সেটা একটা দেখার মতো দৃশ্য ছিল বটে! আর আমার কথাই-বা বাদ যাবে কেন?

প্রাইমারি পার হয়ে ওপরের ক্লাসে অর্থাৎ হাই স্কুলে উঠে পেলাম আরো অনেক গুণী শিক্ষককে। মুসলিম স্যার, শফিকুল ইসলাম দুলাল স্যার, দুলাল গোস্বামী স্যার, নারায়ণ স্যার, সুধীর স্যার, শশধর স্যার– তাঁরা হাইস্কুলে ক্লাস নিতেন। স্কুলজীবনে জীবন গড়ার যে দিকনির্দেশনা আমরা পেয়েছি তা এই শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের মাধ্যমেই। তাঁদের আদর্শ এখনো নেপথ্যে আমাকে পরিচালিত করে। হাইস্কুলে ওঠা মানে শুধু ওপরের ক্লাসেই যাওয়া ছিল না, ছিল টিনের ঘর থেকে পাকা দালানে ক্লাস করার সুযোগ। এটা এক অন্যরকম অনুভূতি। এজন্য খুব গর্ব বোধ

হতো তখন। হাইস্কুলে ওঠার পর অ্যাসেমব্লি নামক বিদ্যালয়-সংস্কৃতির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। ক্লাস শুরু হবার আগেই অ্যাসেমব্লিতে যেতে হতো। পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিতভাবে গাইতে হতো জাতীয় সংগীত 'পাক সার জমিন সাদ বাদ'। আমরা অ্যাসেমব্লি লাইনে দাঁড়িয়ে দুষ্টুমি করতাম। কখনো কখনো ধরাও পড়তাম। ধরা পড়লে আর রক্ষে ছিল না। স্যাররা অফিসরুমে ডেকে নিয়ে যেতেন, বকুনি দিতেন। অ্যাসেমব্লিতে দুষ্টুমি করার জন্য অনেককে পিটুনিও খেতে হয়েছে। সে সময় স্কুল পরিচালনা কমিটিও খুব কড়া ছিল। প্রধান শিক্ষক ছিলেন দীঘুলিয়ার নিজামুদ্দীন স্যার। তিনি ছিলেন আমার দূর-সম্পর্কের দাদা। পদাধিকার বলে এসডিও ছিলেন স্কুল কমিটির সভাপতি। তুলা মোক্তার, আব্দুল জলীল খান ও হেকিম হাবিবুর রহমানের মতো শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ছিলেন কমিটিতে। খুব শক্তিশালী কমিটি ছিল সেটা। সবার কাছেই সম্মানীয় ছিলেন তারা।

ক্লাস ফাইভ থেকেই আমি স্কাউটিং শুরু করি। আমাদের সময় স্কাউট লিডার ছিলেন আনোয়ার উল আলম শহীদ ভাই। পরবর্তীতে যিনি মুক্তিযুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক প্রধান ও স্বাধীনতার পর সচিব ও রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন। আমার জীবনে তাঁর ভূমিকাও কম নয়। স্কুল শেষে নিয়ম করে তিনি আমাদের কুচকাওয়াজ করাতেন, স্কাউটিং এর আদর্শ ও কলাকৌশল শেখাতেন। তাঁর কাছ থেকেই আমরা দুর্যোগকালীন উদ্ধার কলাকৌশল ও আর্তমানবতার সেবায় কী কী করণীয় তা শিখেছি। মাঝেমধ্যেই স্থানীয় পর্যায়ে স্কাউট জাম্বুরি হতো। জাম্বুরিতে আমরা ক্যাম্প ফায়ার করতাম, আগুনের পাশে গোল হয়ে বসে গান, কবিতা ও জোকস উপস্থাপন করতাম। আমি গাজীপুরের মৌচাকে জাতীয় স্কাউট জাম্বুরীতেও অংশ নিয়েছি কয়েকবার। বন্ধুদের মধ্যে জাকারিয়া ফারুক, আব্দুল আওয়াল রিজভী, এমদাদুল হক ফারুক ও নাজিমুদ্দিন ছিল আমার স্কাউট সঙ্গী।

খেলাধুলা আর শরীরচর্চার প্রতি ছোটবেলা থেকেই আমার ঝোঁক ছিল। স্কুল জীবনেও আমি প্রচুর খেলাধুলা করেছি। আমাদের স্পোর্টস টিচার ছিলেন রিয়াজুল হক আনসারি স্যার। সে সময় প্রায়ই বিন্দুবাসিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে টাঙ্গাইলের অন্যান্য স্কুলগুলোর আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা হতো। খুবই উত্তেজনাপূর্ণ খেলা ছিল সেগুলো। খেলা শেষে মারামারিও হতো। ফুটবল খেলতে গিয়ে একবার ধরেরবাড়ী স্কুলের সঙ্গে ভয়াবহ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিলাম আমরা। হাফিজ ইমাম সুখন, মনিরুল ইসলাম খোকা, শহীদুর রহমান তারকাটা আর লুৎফর রহমান মিন্টু ছিল খুব ভালো ফুটবলার। ওদের প্রচেষ্টাতেই স্কুলের হয়ে আমরা মাঝেমধ্যেই বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হতাম।

আমার স্কুলজীবনের সময়টায় বাইসাইকেলের মালিক হওয়া ছিল খুবই প্রেসটিজের বিষয়। খুব কম ছেলেপুলেরই বাইসাইকেল ছিল। আমার বন্ধু কামরুজ্জামান খান কামরুজের (পরবর্তীতে সা'দত কলেজের ভিপি) র‍্যালি ব্র্যান্ডের একটি বাইসাইকেল ছিল। সাইকেলের সামনে ছিল ডি শেপের বাস্কেট। সবার নজর থাকত ওর সাইকেলের দিকে। কামরুজ স্কুলে আসত সাইকেল নিয়ে আর আমি যেতাম আমার পোষা কুকুর 'গোগী'কে নিয়ে। কামরুজ 'গোগী'কে বাস্কেটে বসিয়ে পুরো স্কুল চক্কর দিত। অনেকেই তা তাকিয়ে দেখত।

স্কুলের ইউনিফর্ম আর ব্যক্তিগত পোশাক-পরিচ্ছদও আমার স্মৃতির একটি বড়

টাঙ্গাইলের ঐতিহ্য 'ঘ্যাগের দালান'। নিরালা মোড়ের এই দালানটি এখন শুধুই স্মৃতি

অংশ জুড়ে রয়ে গেছে। পোশাক-আশাকের ব্যাপারে আমি বরাবরই শৌখিন ও খুঁতখুঁতে ছিলাম। এমন হবেই-বা না কেন? আমি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। ফলে শৌখিনতার একটা বড় সুযোগ আমার ছিল। একটু আবদার করলেই মা তা পূরণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। মফস্বল শহরে বসবাস করলেও আমি পোশাক বানাতাম ঢাকা থেকে। শার্ট-প্যান্টের জন্য গ্রিন রোডের 'স্টুডেন্ট টেইলর্স' আর জিনস ও কর্ড কাপড়ের প্যান্টের জন্য বলাকা সিনেমা হলের পাশের 'এম ইব্রাহিম টেইলর্স' ছিল আমার ফেভারিট। সে সময় টেট্রন, ক্যারোলিন ও প্লেবয় ব্র্যান্ডের কাপড় বেশ জনপ্রিয় ছিল। আমি বেল-বটম স্টাইলে প্যান্ট বানাতাম। খুব জনপ্রিয় ফ্যাশন ট্রেন্ড ছিল এই বেল-বটম প্যান্ট।

সেই ষাটের দশকই হোক আর একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকই হোক, স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখার দোষটা কমবেশি সব ছাত্রেরই ছিল এবং আছে। বই-খাতা শার্ট-প্যান্টের ভেতর ভরে স্কুল পালিয়ে আমরাও কম সিনেমা দেখিনি। আমাদের পছন্দের তালিকায় ছিল রওশন ও রূপবাণী সিনেমা হল। সিন্দাবাদ দি সেইলর, গোলিয়াত আর হারকিউলিসের মতো জনপ্রিয় ইংলিশ সিনেমাগুলো স্কুল পালিয়ে আমরা ঐ দুই হলেই দেখতাম। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা। শুধু ইংলিশ সিনেমাই নয়, আমরা উর্দু সিনেমারও ভক্ত ছিলাম। পাকিস্তানি জনপ্রিয় নায়ক ওয়াহিদ মুরাদ, মোহাম্মদ আলী, সন্তোষ, দর্পণ, সুধীর, এজাজ, নাদিম ও পূর্ব পাকিস্তানের রহমানের ছবি আমরা কখনো মিস করিনি। জেবা, সাবিহা, নিলু, দিবা, শামীম আরা, শবনম, গাজালা, তারানা আর পূর্ব পাকিস্তানের নাসিমা খান নায়িকা হিসেবে ছিল আমাদের মোস্ট ফেভারিট। রুপালি পর্দায় তাদের মনোমুগ্ধকর অভিনয় দেখতে কী চঞ্চলতাই না কাজ করত আমাদের মধ্যে! আমার দেখা প্রথম সিনেমাস্কোপ চলচ্চিত্রটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের নায়ক হারুন এবং পূর্ব পাকিস্তানের খলিল, সুমিতা ও রোজী সামাদ অভিনিত 'সঙ্গম'। সিনেমাটি রূপবাণী হলে প্রদর্শিত হয়েছিল। খুব স্পষ্ট মনে পড়ে এসব স্মৃতি।

শুধু সিনেমা দেখাই নয়, যে শিক্ষকের ক্লাস আমাদের পছন্দ হতো না তাদের ক্লাস ফাঁকি দিয়ে আমরা নিরালা মোড়ের টেনু মিয়ার সাইকেলের দোকানে বসে সিগারেটে সুখটান দিতাম। কিন্তু সিগারেট কি আর একা খাওয়ার জিনিস! ইউসুফ, থানাপাড়ার আবুল আর গালার জাহিদ ছিল এ কাজে আমার নিয়মিত সঙ্গী। তবে শুধু সিগারেটেই নয়, গোঁফওয়ালা মদনের টেস্টি চানাচুর আর বাবু লালের মুখরোচক প্যাঁচও আমরা নিয়মিত খেয়েছি। টাঙ্গাইলে প্যাঁচ এখনো পাওয়া যায়, তবে বাবু লালের প্যাঁচ যারা না খেয়েছে তারা এ দুইয়ের পার্থক্য বুঝবে না।

তবে আমরা যে সব সময়ই ক্লাস ফাঁকি দিতাম, তা নয়। আমাদের পছন্দের ক্লাসও ছিল। বিশেষ করে, রিয়াজ স্যারের ক্লাসগুলো আমি খুব উপভোগ করতাম। মজার মানুষের ক্লাস তো মজারই হবে। ক্লাসে স্যার গল্প বলতেন একটু বেশি। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হয়ে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। যুদ্ধ করেছেন মিয়ানমারে। স্যারের সেই সৈনিক জীবনের গল্প কি আর সহজে ফুরায়! তবে স্যার নিজে গল্প করলেও ক্লাসে আর কাউকেই কথা বলতে দিতেন না। আমাদের সঙ্গে রিয়াজ স্যারের ক্লাস ছিল টিফিনের ঠিক আগে। নিজের সাবজেক্ট নিয়ে একটু কথা বলেই তিনি ক্যাপ্টেনকে বলতেন, 'শান্ত ছেলেদের নাম ল্যাখ, দুষ্টু ছেলেদের নাম ল্যাখ।' ক্লাস ক্যাপ্টেন পটাপট শান্ত ছেলেদের নাম লিখে স্যারকে দিত। তবে তোপের মুখে পড়ার ভয়ে দুষ্টু ছেলেদের নাম সে সহজে লিখতে চাইত না। নিরুপায় হয়ে দু-একজন দুষ্টু ছেলের নাম লিখে সে যখন স্যারকে দিত তখন তাদের ভাগ্যে জুটত বেতের কড়া বাড়ি। সে দৃশ্য আমার এখনো চোখে ভাসে : দুষ্টু ছেলেদের স্যার বলছেন, 'নে, হাত পাত।' তারপর বাড়ির শব্দ। এক হাতে বাড়ি দেবার পর স্যার সুর একটু নরম করে বলছেন, 'ওই হাতেও আরেকটা নে।' যেন তিনি মিষ্টি বিতরণ করছেন! তারপর আবারও বাড়ির শব্দ। আর শান্ত ছেলেদের ভাগ্যে জুটত দশ মিনিট আগেই ছুটি। তবে আমি কোন দলের ছিলাম তা কিন্তু আর বলছি না।

বিন্দুবাসিনী স্কুল নিয়ে আমার স্মৃতি শুধু সুখেই ভরপুর নয়, এখানে বিচ্ছেদও আছে। ক্লাস এইটে পড়ি। এক সাবজেক্টে রেজাল্ট খারাপ হওয়ায় সেকেন্ড কলে পাশ করতে হয়েছিল। বিষয়টি আমি মেনে নিলেও আমার মা মেনে নিতে পারেননি। তিনি আমাকে আরো এক বছর এইটে থেকে যেতে বলেন। কিন্তু জুনিয়রদের সঙ্গে ক্লাস করাটা আমার জন্য অস্বস্তিকর ছিল। ফলে বাধ্য হয়েই আমাকে স্কুল বদলাতে হয়। ক্লাস এইটের ছাত্র হয়ে আমি দ্বিতীয় বছরটি পার করি লাউহাটির আজহার মেমোরিয়াল স্কুলে। কিন্তু ওখানে আমার মন টেকেনি। ক্লাস নাইনে উঠে আমি আবারও আমার প্রিয় স্কুল বিন্দুবাসিনীতে ফিরে আসি। সে হিসেবে বিন্দুবাসিনীর '৬৯ ও '৭০-এ দুটি ব্যাচ আমারই। সিন্টু ও হারুণ সে সময় থেকেই আমার বন্ধু হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ওরা আমার এক বছরের জুনিয়র বন্ধু।

আগেই বলেছি, ক্লাস থ্রি থেকে টেন পর্যন্ত বিন্দুবাসিনীর ছাত্র থাকা অবস্থায় অনেক জ্ঞানী-গুণী শিক্ষককে আমি পেয়েছি। আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য গর্বিত। কিন্তু যদি আমার কয়েকজন আদর্শ শিক্ষকের নাম বলি তবে এ তালিকা কিছুটা ছোট হয়ে আসবে। দুলাল গোস্বামী স্যার, ডাক্তার বাবু স্যার, হিরেন চক্রবর্তী স্যার, নগেন স্যার, গফুর স্যার, সামাদ স্যার, মোসলেম উদ্দিন স্যার, শফিকুল ইসলাম দুলাল স্যার, নারায়ণ স্যার ও সুধীর স্যার– তাঁরা প্রত্যেকেই আমার আদর্শ শিক্ষক। আমি শ্রদ্ধাভরে এখনো তাঁদের স্মরণ করি।

আমার স্কুলজীবনের একটি ঘটনা না উল্লেখ করলেই নয়। আমাদের উর্দু স্যারের একটি বিশেষ অভ্যাস ছিল। তিনি ক্লাসে ঢুকেই জিগ্যেস করতেন, 'কে কে ক্লাস করবি না? বের হয়ে যা।' আমি বের হয়ে যেতাম। এটা স্যারের জন্য নয়, উর্দুর প্রতি আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। দুষ্টুমি করে বলতাম, 'কালির মধ্যে তেলাপোকা চুবিয়ে ছেড়ে দিলেই উর্দু লেখা হয়ে যায়।' তবে পরীক্ষার পর স্যারকে বলতাম, 'স্যার, পাশ নম্বরটা অন্তত দিয়েন।' তিনি দিতেন। অর্থাৎ ক্লাস না করেও আমি উর্দুতে ফেল করিনি কখনো।

নানা রঙের সেই দিনগুলোর কথা মনে হতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে নীরালা মোড়, নীরালা মোড়ে উটের পিঠের মতো খাড়া পুল আর ঘ্যাঁগের দালানের কথা। আগেই উল্লেখ করেছি, ঘ্যাঁগের দালানের সামনে ছিল টেনু মিয়ার সাইকেলের দোকান। দুষ্টু বন্ধুরা জোট বেঁধে সিগারেট ফুঁকতাম। এই অভ্যাসটা ধরিয়ে দিয়েছিল পাশের বাসার দুদু মিয়া। বয়সে বড় হলেও খেলতে খেলতে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে যায়। সম্ভবত পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার

আমার স্কুলজীবনের একটি ঘটনা না উল্লেখ করলেই নয়। আমাদের উর্দু স্যারের একটি বিশেষ অভ্যাস ছিল। তিনি ক্লাসে ঢুকেই জিগ্যেস করতেন, 'কে কে ক্লাস করবি না? বের হয়ে যা।' আমি বের হয়ে যেতাম। এটা স্যারের জন্য নয়, উর্দুর প্রতি আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। দুষ্টুমি করে বলতাম, 'কালির মধ্যে তেলাপোকা চুবিয়ে ছেড়ে দিলেই উর্দু লেখা হয়ে যায়।'

মুহূর্তে দুদুই আমাকে এই সিগারেট ফুঁকা শেখায়। সেই নেশা আজও অব্যাহত আছে। তবে এই সিগারেট পর্যন্তই। বন্ধুদের কেউ কেউ সেই বয়স থেকেই জুয়া খেলত, মদ পান করত। আমি তাদের সঙ্গে মিশলেও কোনো দিন ওই কাতারে শামিল হইনি। মা ছিলেন যথেষ্ট ব্যক্তিত্বময়ী। আমার জীবনে তাঁর প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। তিনি বলে দিয়েছিলেন– ওগুলো খুব খারাপ অভ্যাস– মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। মা-র কথা মনে করে কখনো ওগুলো রপ্ত করিনি। মদের দোকানের মঙ্গল পালও ছিল আমার এক বন্ধু। দয়াল সাহার দোকানে আড্ডা বসত– বাংলা মদ নিয়ে আসত মঙ্গল। কিশোর বয়সে ছোট বোতলে বাংলা মদ খেয়ে ওরা বোঝাতে চাইত ওরা বড় হয়েছে।

আরো একটা স্মৃতির কথা মনে পড়ে। অবাঙালি কাবুলিওয়ালা– আফগানিস্তান থেকে আসা পাঠান, নাম গোলাপ খাঁন। রাস্তায় ওষুধ বিক্রি করত। কখনো পাবলিক লাইব্রেরির সামনে, কখনো মেইন রাস্তায়। হাতের রঙিন ডুগডুগিতে বাড়ি দিয়ে বলত– 'আইয়ে, আইয়ে, গোলাপ খাঁনকে দাওয়া খাইয়ে। ইয়ে দাওয়াই বানা হ্যায় আখরোট, পেস্তা বাদাম, পাহাড়কা পসিনা শিলা জুদছে– অওর কয়ি জরিবুটিওছে– এ দাওয়া খানেছে...দুবলা অওর পাতলা আদমি অ্যায়ছাছে অ্যায়ছা হো জায়েগা...আও ভাই, গোলাপ খাঁন কি দাওয়া খাও।' মুহূর্তেই তার চারপাশে লোকের ভিড় জমে যেত। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে তার বক্তৃতার মজা নিতাম। লোকটা তার শক্ত পেশিতে অন্য হাত দিয়ে থাপ্পড় দিয়ে বলত– 'আপ লোক ভি এ দাওয়াই খেলে এতনা তাগদ পায়েগা।' আমার খুব হাসি পেত– অনেক লোকই তার ওষুধ কিনত।

যে খাল ছিল টাঙ্গাইল শহরের অপার সৌন্দর্যের একটি– সেই খালের কথা খুব মনে পড়ে। আর মনে পড়বেই বা না কেন– এই খালে রয়েছে আমাদের শৈশবের নানা স্মৃতি। স্কুলের পাশ দিয়ে লৌহজং নদীতে গিয়ে পড়া এই খালে সারা বছরই পানি থৈথৈ করত। তবে বর্ষায় এর রূপ ছিল অন্যরকম। আমরা বিন্দুবাসিনী স্কুলের পাশের ব্রিজ কিংবা পার্কের গাছের মগডাল থেকে লাফ দিয়ে খালের পানিতে নেমে যেতাম– স্রোতের টানে ভেসে যেতে কী আনন্দই না লাগতো! বর্ষায় খালে অনেক মহাজনি ও গয়নার নৌকা চলাচল করত। ঘাটেও অনেক নৌকা বাঁধা থাকত, অনেকে গয়নার নৌকা ভাড়ায় নিয়ে বেড়াতে যেত, পিকনিকে যেত। আমরাও কিশোর বন্ধুরা মিলে বনভোজনের পরিবর্তে অনেকবার 'নদীভোজনে' গিয়েছি।

বিন্দুবাসিনী স্কুলের স্মৃতির সঙ্গে আমার শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতিগুলো একাকার হয়ে আছে। জমা হয়ে আছে মনের গোপন সিন্দুকে। যখন দরজা খুলি স্মৃতিগুলো আমাকে নিয়ে যায় আনন্দমগ্ন অতীতে–।

বলতে গিয়ে অনেক কথাই বলা হয়ে গেল। খণ্ড খণ্ড স্মৃতিগুলো বেশ বড় একটি নিবন্ধ তৈরি করে ফেলেছে। তার পরও আরো অনেক কথাই বলার আছে।

• **লেখক**, নির্বাহী পরিচালক, বুরো বাংলাদেশ

হৃদরোগ
প্রতিরোধ ও প্রতিকার

ডা. মাহমুদুল হাসান

মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে হার্ট বা হৃৎপিণ্ড একটি জরুরি অঙ্গ। হার্টের কর্মক্ষমতার ওপর বেঁচে থাকা, শক্তি, শারীরিক কর্মক্ষমতা, বলতে গেলে শারীরিক সবকিছুই নির্ভরশীল। হার্টের দ্বারা রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশে পুষ্টি এবং শক্তি সঞ্চালিত হয়, অক্সিজেন সরবরাহ হয় এবং কার্বনডাই অক্সাইড নির্গমন হয়। অন্য যে-কোনো অঙ্গ অকেজো বা নষ্ট হয়ে গেলে শুধু ওই অঙ্গের কার্যের ব্যাঘাত ঘটে, কার্যক্ষমতা লোপ পায় কিন্তু হৃৎপিণ্ড নষ্ট বা বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ মারা যায়।

হৃদরোগ বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন– জন্মগত হৃদরোগ, করোনারি হৃদরোগ, হার্ট ফেইলর, কার্ডিওমায়োপ্যাথি, উচ্চ রক্তচাপজনিত হৃদরোগ, সরবরাহকারী রক্তবাহিকার অসুখ, যেমন– প্রান্তিক ধমনির রোগ, রিউম্যাটিক হৃদরোগ (বাতজ্বরের কারণে হৃদপেশি ও ভাল্‌ভ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া), কার্ডিয়াক ডিসরিদ্মিয়াস ইত্যাদি।

হৃদরোগের কারণসমূহ

অলস জীবনযাত্রা ও খাবারদাবারে অসচেতনতার ফলে অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, ধূমপান, অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, অতিরিক্ত উৎকণ্ঠা, অতিরিক্ত মদ্যপান এবং পারিবারিক হৃদরোগ ইতিহাস।

কোন বয়সে হতে পারে?

হৃদরোগ সব বয়সেই হতে পারে। তবে সাধারণত বয়স্ক ব্যক্তিরাই এ রোগের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। সাধারণভাবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সিরাম কোলেস্টেরলের মাত্রাও বাড়ে। ৬৫ বছরের বেশি বয়সি হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ৮২ শতাংশই হৃদরোগে মারা যায়। আবার ৫৫ বছর বয়সের পরে স্ট্রোক করার আশঙ্কাও দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আবার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধমনির স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়, ফলে করোনারি ধমনি রোগ হয়।

কাদের হতে পারে?

নারীর তুলনায় পুরুষদের হৃদরোগ হবার ঝুঁকি বেশি। মধ্যবয়সি মানুষের ক্ষেত্রে, করোনারি হৃদরোগে আক্রান্তের সম্ভাবনা নারীদের তুলনায় পুরুষদের প্রায় ৫ গুণ বেশি। তবে প্রজননের বয়স পেড়িয়ে গেলে নারী ও পুরুষের হৃদরোগ হওয়ার আশঙ্কা সমান। যদি কোন নারীর ডায়াবেটিস থাকে, তার হৃদরোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত পুরুষের চেয়ে বেশি।

হৃদরোগের লক্ষণ ও উপসর্গসমূহ

১. বুক, পিঠ, পেট, গলা, বাম বাহুতে ব্যথা, ঘাড় বা চোয়ালে ব্যথা এবং অস্বস্তি অনুভূত হতে পারে।
২. বুক চেপে আসা ও শ্বাসকষ্ট।

৩. ওপরের পেটে চাপ বা অসহনীয় ব্যথা অনুভূত হবে। অনেকেই এটাকে গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা মনে করে অবহেলা করেন। অ্যান্টাসিড বা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেয়ে ব্যথা না কমলে জরুরিভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৪. মাথা হালকা লাগতে পারে।

জন্মগত হৃদ্‌রোগ প্রতিরোধে করণীয়

১. গর্ভধারণের কমপক্ষে তিন মাস আগে মাকে M M R Injection দিতে হবে, যাতে তার Rubella I German Measles না হয়।

২. গর্ভবতী মায়ের উচ্চরক্তচাপ বা ডায়াবেটিস থাকলে অবশ্যই চিকিৎসা করতে হবে।

৩. গর্ভধারণের তিন মাস পর্যন্ত গর্ভবতী মায়ের কোনো ধরনের Xraz বা Radiation করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

৪. ধূমপান ও মদ্যপানের অভ্যাস থাকলে সেটা অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে।

৫. গর্ভবতী অবস্থায় যে-কোনো রকম ওষুধ খাওয়ার পূর্বে অবশ্যই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

অন্যান্য হৃদ্‌রোগ প্রতিরোধে করণীয়

স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের মাধ্যমে হৃদ্‌রোগের প্রাদুর্ভাব কমানো যায়। কমবয়সি ছেলে বা মেয়ের গলাব্যথাসহ জ্বর হলে তাকে পেনিসিলিন ট্যাবলেট দিয়ে চিকিৎসা করলে ভবিষ্যতে রিউমেটিক হৃদ্‌রোগ হওয়ার আশঙ্কা অনেকটা হ্রাস পাবে।

হৃদ্‌রোগ প্রতিরোধে খাবার এবং জীবনযাপনে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। যেমন–

১. প্রতিদিন কমপক্ষে একটি নির্দিষ্ট সময় হাঁটা বা ব্যায়াম অথবা শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে। এটা হৃদ্‌রোগ প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর।

২. ধূমপান বর্জন করতে হবে। হৃদ্‌যন্ত্রের অন্যতম প্রধান শত্রু ধূমপান। ধূমপায়ীদের শরীরে তামাকের নানা রকম বিষাক্ত পদার্থের প্রতিক্রিয়ায় উচ্চরক্তচাপসহ ধমনি, শিরার নানা রকম রোগ ও হৃদ্‌রোগ দেখা দিতে পারে। ধূমপান অবশ্যই বর্জনীয়। ধূমপায়ীর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকুন। তামাক পাতা, জর্দা, গুল লাগানো ইত্যাদিও

ফাস্টফুড, টিনজাত ও শুকনো খাবার খাওয়া কমাতে হবে।

অতিরিক্ত পরিমাণে চা, কফি এবং কোমল পানীয় বর্জন করতে হবে।

মানসিক চাপ অর্থাৎ অনিদ্রা, টেনশন, ভয়, ক্রোধ, হতাশা, রাগ, প্রতিশোধপ্রবণতা, হিংসা ইত্যাদি বর্জন করতে হবে

পরিহার করতে হবে। ধূমপান ছাড়ার পরবর্তী ১০ বছর সময় পর্যন্ত হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি থেকে যায়।

৩. প্রচুর পরিমাণে ফলমূল, শাকসবজি, তরকারি, টক জাতীয় ফল খেতে হবে। অপরদিকে লবণ ও চিনি কম খেতে হবে।

৪. অতিরিক্ত লবণ, চর্বি ও বেশি ক্যালরিসমৃদ্ধ খাবার বর্জন করতে হবে। আঁশযুক্ত খাবার বেশি খেতে হবে। আটার রুটি এবং সুজি জাতীয় খাবার পরিমাণ মতো খাওয়া ভালো। খাবারের আইটেমে নানা রঙের শাকসবজি ও ফলমূল থাকা বাঞ্ছনীয়। তাজা ফলে প্রচুর আঁশ এবং ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ, এতে ক্যালোরি কম থাকে ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান বেশি থাকে– সতেজ ও সবল হৃদ্‌যন্ত্রের জন্য যা সহায়ক।

৫. ফাস্টফুড, টিনজাত ও শুকনো খাবার খাওয়া কমাতে হবে।

৬. অতিরিক্ত পরিমাণে চা, কফি এবং কোমল পানীয় বর্জন করতে হবে।

৭. অ্যালকোহল বা যে-কোনো ধরনের মাদক বর্জন করতে হবে।

৮. মহিলাদের জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি এবং কিছু কিছু ওষুধ হৃদ্‌রোগের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

৯. স্থূলতা হ্রাস করতে হবে। শরীরে চর্বি জমতে দেওয়া যাবে না। এটা হৃদ্‌রোগের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম না করলে শরীরে ওজন বেড়ে যেতে পারে। এতে হৃদ্‌যন্ত্রকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়, ফলে অধিক ওজনসম্পন্ন লোকদের উচ্চ রক্তচাপসহ ধমনি, শিরার নানা রকম রোগ ও হৃদ্‌রোগ দেখা দিতে পারে। খাওয়াদাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ও নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে।

১০. বিএমআই ২৫-এর চেয়ে যত বেশি হবে, সেটা হৃদ্‌রোগের জন্য ততটাই ঝুঁকিপূর্ণ। ওজন যত কিলোগ্রাম হবে, তাকে উচ্চতা যত মিটার তার বর্গ দিয়ে ভাগ করে বিএমআই নির্ণয় করতে হয়।

১১. ৪০ বছরের বেশি বয়সিদের ক্ষেত্রে, সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। প্রাণিজ চর্বি খাওয়া যাবে না, তবে উদ্ভিদ তেল খেতে হবে, যেমন– সয়াবিন, সূর্যমুখী, সরিষার তেল ইত্যাদি। সামুদ্রিক মাছ খেতে হবে। বাদাম হৃদ্‌রোগের জন্য উপকারী। বাদামের ভেষজ প্রোটিন, ফলিক অ্যাসিড, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফ্লাভোনয়েডস, সেলিনিয়াম ও ভিটামিন 'ই' হৃদ্‌রোগের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

১২. দাম্পত্য জীবনে সুখী থাকার চেষ্টা করতে হবে এবং ধর্মকর্মে মনোযোগী হতে হবে।

১৩. মানসিক চাপ অর্থাৎ অনিদ্রা, টেনশন, ভয়, ক্রোধ, হতাশা, রাগ, প্রতিশোধপ্রবণতা, হিংসা ইত্যাদি বর্জন করতে হবে।

১৪. উচ্চরক্তচাপ ও ডায়াবেটিস থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কমপক্ষে সপ্তাহে এক দিন রক্তচাপ পরীক্ষা এবং মাসে একবার করে ডায়াবেটিস পরীক্ষা করতে হবে।

অসংক্রামক রোগগুলির মধ্যে হৃদ্‌রোগ মৃত্যুর একটি অন্যতম প্রধান কারণ; বিশেষ করে, ডায়াবেটিসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হৃদ্‌রোগে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। হৃদ্‌রোগের লক্ষণ জানলে এবং সচেতন থাকলে সহজেই হৃদ্‌রোগজনিত মৃত্যু থেকে অনেকটা নিরাপদে থাকা যায়। নিয়মিত হাঁটা বা কিছু শারীরিক পরিশ্রম, রাগ বা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ, সব ধরনের মাদক বর্জন এবং খাবারের ক্ষেত্রে সচেতন হলে সহজেই হৃদ্‌রোগ থেকে নিরাপদে থাকা যায়।

• **লেখক,** পরিচালক, বুরো হেলথ কেয়ার

বুরো ক্রাফ্‌ট ■ যেভাবে যাত্রা শুরু

নজরুল ইসলাম

বুরো বাংলাদেশ সূচনালগ্ন থেকেই বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহযোগিতায় অনেকগুলো উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অতি সফলতার সঙ্গে প্রকল্পাকারে বাস্তবায়ন করে আসছে। বেশকিছু দাতা সংস্থার সঙ্গে কাজ করলেও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সহযোগিতায় এর আগে কখনো কোনো কার্যক্রম করা হয়নি। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রকল্পের ধরন ও সংস্থার কার্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকায় এ সুযোগটি হয়ে ওঠেনি। কিন্তু কাজ করার ইচ্ছা বা বাসনা শেষ হয়ে যায়নি। কথায় বলে, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। ঠিক তাই, ২০১২ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন INSPIRED (Integrated Support to Poverty and Inequality Reduction through Enterprise Development) Bangladesh নামে একটি ইনোভেটিভ প্রকল্প হাতে নেয়।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের ২ হাজার গ্রামীণ দরিদ্র নারীকে প্রাকৃতিক আঁশ উৎপাদন ও সেই আঁশ দিয়ে ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প পণ্য উৎপাদনে দক্ষ করে গড়ে তোলা, যাতে তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন। প্রকল্পটি এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যাতে প্রশিক্ষণের আওতায় প্রশিক্ষিত ২ হাজার নারীর সাথে পরোক্ষভাবে আরো ১০ হাজার নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে দেশের পিছিয়ে পড়া নারী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম করাই ছিল এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

এই প্রকল্পের আওতায় প্রাকৃতিক আঁশ সংক্রান্ত ইনোভেটিভ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রস্তাবনা চাওয়া হয়।

প্রস্তাবনার শর্ত ছিল কোনো এনজিও সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে অন্য কোনো ব্যবসায়ী সংগঠন বা নেটওয়ার্কের সঙ্গে পার্টনার হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাবে। আমি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে BWCCI-এর কথা আলোচনা করলাম। BWCCI-এর সঙ্গে আমাদের পথচলাও বেশ আগে থেকেই।

শুরু হলো দ্বিপক্ষীয় আলাপ-আলোচনা, সভা, প্রকল্পের ধারণাপত্র প্রণয়নসহ প্রকল্পের কাজ কী হবে, প্রকল্পের কার্যক্রম কোথায় পরিচালিত হবে ইত্যাদি। ধারণাপত্র তৈরি করতে গিয়ে বুঝলাম এটি একটি ইনোভেটিভ প্রকল্প হবে, যা আগে বাংলাদেশে কেউ কখনো করেনি। আর ইনোভেটিভ প্রকল্পটি হবে কলাগাছের বাকল বা খোল আর আনারসের পাতা থেকে আঁশ (সুতা) তৈরি করা।

মাসখানেক খাটাখাটুনি করে প্রকল্প ধারণাপত্র বা Project Concept Note (PCN) প্রণয়ন করা হলো। প্রকল্প ধারণাপত্র বা Project Concept Note (PCN) প্রণয়ন করতে গিয়ে জানতে পারলাম :

দেশে কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে কৃষিবর্জ্য তৈরি হয়। ফসল সংগ্রহের পর অবশিষ্ট উপাদান হতে কিছু অংশ পশুখাদ্য এবং কিছু অংশ গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে কলা ও আনারস উৎপাদনের পর অবশিষ্ট বাকল ও পাতা যে বর্জ্য তৈরি করে তা তেমন কোনো কাজে ব্যবহৃত হয় না। তাই এ থেকে প্রচুর বর্জ্য উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১ লাখ ৩৩ হাজার ৩০৫ একর জমিতে ৩০-৪০ প্রজাতির কলা চাষ করা হয়।

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই কমবেশি কলা চাষ করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কলা চাষ করা হয় রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, নোয়াখালী, ফরিদপুর, খুলনা, নরসিংদী, গাজীপুর, বরিশাল, গাইবান্ধা, নাটোর, টাঙ্গাইল, বগুড়া, পাবনা, সিলেট, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায়।

বাংলাদেশের প্রায় ৪৫ হাজার ৬৮৫ হেক্টর জমিতে আনারস চাষ করা হয়। যার ফলন প্রায় ২ লাখ ৩৪ হাজার ৮৬৫ মেট্রিক টন। বাংলাদেশের টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, গাজীপুর,

সিলেট, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলায় প্রচুর পরিমাণে আনারস চাষ হয়।

এ সকল জমিতে যে পরিমাণ কলা ও আনারসের বর্জ্য তৈরি হয় তা দ্বারা বিকল্প কিছু তৈরির কোন প্রকার উদ্যোগ আমাদের দেশে নেই। এসব বর্জ্য যেমন মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাস করে, তেমনিভাবে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটিয়ে থাকে।

অথচ কলাগাছ ও আনারসের পাতার আঁশ দ্বারা ব্যবহার উপযোগী পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে এই বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করে এর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম খাত হচ্ছে পোশাকশিল্প আর এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে সুতা। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২.৫ মিলিয়ন বেল সুতার প্রয়োজন হয়। যার মাত্র ০.১ মিলিয়ন বেল স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন হয়। জাতীয় চাহিদার মাত্র ৪-৫ ভাগ সুতা স্থানীয়ভাবে জোগান দেওয়া হলেও এর বাকি ৯৫-৯৬ ভাগ সুতা বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। যার ব্যয় প্রতি বছর প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা।

বাংলাদেশে যে পরিমাণ কলা চাষ করা হয় তা থেকে প্রতি বছর প্রায় ৩৭৭৭৮.৭৪ টন এবং আনারস থেকে ১৬ হাজার মেট্রিক টন আঁশ উৎপাদন করা সম্ভব। কলাগাছ ও আনারসের পাতার আঁশ উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরাসরি তুলা বা তুলার সঙ্গে মিশিয়ে কাপড়, শাড়ি, অ্যাপারেল, বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প, মুদ্রা তৈরির কাগজ, ক্রাফট পেপার, পলিউড তৈরি করা সম্ভব। কলাগাছ ও আনারসের পাতার উৎপাদিত আঁশ ছাড়াও আঁশ উৎপাদনের পর এর বর্জ্য জৈব সার হিসেবে কৃষিজমিতে ব্যবহার করা যায়।

বর্তমানে কলাগাছ ও আনারসের পাতার আঁশ অস্ট্রেলিয়া, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, নেপাল, ফিলিপাইন, রুয়ান্ডা, শ্রীলঙ্কা, উগান্ডা ও ভিয়েতনামসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শৌখিন পণ্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইনোভেটিভ প্রকল্পটির কলাগাছের বাকল বা খোল আর আনারসের পাতা থেকে আঁশ (সুতা) উৎপাদন বাংলাদেশে এই প্রথম হবে আর এর সাক্ষী হয়ে থাকাটা সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার।

সৌভাগ্যক্রমে উক্ত প্রকল্পের একজন কর্মী হিসেবে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। একদিকে চলছিল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সাংগঠনিক কার্যক্রম অন্যদিকে তথ্যসংগ্রহ। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মী হিসেবে আমার সারা দুনিয়া চষে বেড়ানোর সুযোগ হয়েছিল। পৃথিবীর কোন কোন দেশে এ জাতীয় কাজ হচ্ছে, এ কাজ করার জন্য কোন কোন দেশের মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে, মেশিনের শক্তি এবং উৎপাদনক্ষমতা কত, মেশিনের মূল্য কত, মেশিন কোম্পানির সেবাদান পদ্ধতি কী, আঁশ দ্বারা কী কী পণ্য তৈরি হচ্ছে, কীভাবে হচ্ছে এবং তা কোথায় কোথায় বিক্রি হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়। সবকিছু বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো আমরা ভারতের তামিলনাড়ু থেকে মেশিন আমদানি করব।

নেটবাজারের তালিকা ও তথ্যানুযায়ী আমরা চার-পাঁচটি কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করলাম এবং বাস্তবে তাদের মেশিন, উৎপাদনক্ষমতা, আঁশের মান, পণ্য উৎপাদন কৌশল ও পণ্যের বাজার সরেজমিনে দেখার জন্য চার সদস্যবিশিষ্ট একটি টিম ২০১৪ সালে ভারতের তামিলনাড়ু পরিদর্শন করি। সার্বিক দিক বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো Banana fiber research foundation-এর মেশিনটি আমাদের জন্য উপযুক্ত। আমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেখান থেকেই মেশিনটি আমদানি করা হয়।

মেশিন আমদানির পরপরই প্রকল্পের মূল কাজ শুরু হয়। শুরু হয় সদস্যদের আঁশ উৎপাদন, আঁশ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন, পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন স্থানীয় মেলায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, মেশিন আমদানির দীর্ঘসূত্রিতা এবং প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি না করার কারণে মেশিন আমদানির পর মূল কাজ করার খুব একটা বেশি সময় পাওয়া যায়নি। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। ফলে প্রকল্পের বেশিরভাগ উদ্দেশ্যই অর্জন সম্ভব হয়নি। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে সম্ভাবনাময় একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও বুরো বাংলাদেশ তার নিজস্ব অর্থায়নে ইনোভেটিভ এই প্রকল্পটির কার্যক্রম নতুন আঙ্গিকে 'বুরো ক্রাফট' নামে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার কাকরাইদে আঁশ উৎপাদন ও আঁশ দিয়ে বাহারি পণ্য তৈরির জন্য স্থায়ীভাবে একটি কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে, যেখানে কলাগাছ ও আনারসের পাতার আঁশ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের শৌখিন পণ্য তৈরি করা হবে। এসব পণ্যসামগ্রী বিক্রির জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ইন্সপায়ার্ড প্রকল্পের সামগ্রিক অভিলক্ষ্যের পাশাপাশি বুরো ক্রাফট আরো কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ:

ক. দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য সংশ্লিষ্ট নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা

খ. ঐতিহ্যবাহী ও বাজারচাহিদা ভিত্তিক হস্তশিল্প উৎপাদন ও এর বাজার সম্প্রসারণে সহযোগিতা করা

গ. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাকৃতিক আঁশজাত হস্তশিল্প পণ্য বাজারজাত করা

ঘ. স্বল্প খরচে উচ্চমানের পরিবেশ বান্ধব পণ্য উৎপাদন করা

ঙ. নারীদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটিয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অংশীদার হওয়া।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কলাগাছ ও আনারসের পাতার অবহেলিত এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সরকারিভাবে ব্যাপক সহযোগিতা করা হলেও আমাদের দেশে সরকারি কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। নতুন এই সম্ভাবনাকে আরো বিস্তৃত করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন :

১. আধুনিক যন্ত্রপাতির জোগান ২. দক্ষ জনবল তৈরি ৩. নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি ৪. বাজারে প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি ৫. পণ্যের বৈচিত্র্য আনয়ন ৬. প্রচুর গবেষণা করা ৭. পর্যাপ্ত আর্থিক সহযোগিতা।

উপরিউক্ত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করা হলে বাংলাদেশের অবহেলিত এই কৃষিজবর্জ্য সম্পদে পরিণত হবে। যার ফলে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূর হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে শৌখিন পণ্য প্রবেশের মাধ্যমে জাতীয় রপ্তানি আয় আরো বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের ভাবমূর্তিও সমুজ্জ্বল হবে।

• **লেখক,** সমন্বয়কারী, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, বুরো বাংলাদেশ

আধুনিক পদ্ধতিতে মাল্টা চাষ

মিষ্টি কমলা বা Sweet orange (Citrus sinensis) বাংলাদেশে মাল্টা নামে পরিচিত। কমলার সঙ্গে এর মূল পার্থক্য হলো কমলার খোসা ঢিলা কিন্তু মাল্টার খোসা সংযুক্ত। সাইট্রাস ফসলের মধ্যে মাল্টা অন্যতম জনপ্রিয় ফল। বিশ্বের সর্বমোট উৎপাদিত সাইট্রাস ফলের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ হচ্ছে মাল্টা। ভিয়েতনাম, উত্তর পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণ চীন মাল্টার আদি উৎপত্তি স্থান। তবে বর্তমানে এই ফলটি বিশ্বের উষ্ণ ও অব-উষ্ণমণ্ডলীয় এলাকায় বেশি চাষাবাদ হচ্ছে। বাংলাদেশেও এই ফলটির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং দিন দিন এর জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। কমলার তুলনায় এর অভিযোজন ক্ষমতা অধিক হওয়ায় পাহাড়ি এলাকা ছাড়াও দেশের অন্যান্য এলাকায় সহজেই এটি চাষ করা যাচ্ছে। উন্নত জাত ও আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশে এর উৎপাদন বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব।

মাল্টার জাত : বাংলাদেশের বাজারে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত সবুজ ও কমলা বর্ণের মাল্টা ব্যাপক হারে বিক্রি হতে দেখা যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট 'বারি মাল্টা-১' নামে ২০০৩ সালে মাল্টার একটি উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে। এ জাতের পাকা ফল দেখতে আকর্ষণীয় সবুজ এবং খেতে সুস্বাদু।

বারি মাল্টা-১ : নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চফলনশীল জাত। গাছ খাটো, ছড়ানো ও অত্যধিক ঝোপালো। মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র পর্যন্ত সময়ে গাছে ফুল আসে এবং কার্তিক মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল গোলাকার, মাঝারি আকৃতির (১৫০ গ্রাম)। ফলের দৈর্ঘ্য ৭ সেমি এবং প্রস্থ ৫ সেমি। পাকা ফলের রং সবুজ। ফলের পুষ্প প্রান্তে পয়সা সদৃশ সামান্য নিচু বৃত্ত বিদ্যমান। ফলের খোসা মধ্যম পুরু ও শাসের সঙ্গে সংযুক্ত। শাঁস হলুদাভ, রসালো, খেতে মিষ্টি ও সুস্বাদু (ব্রিক্সমান ৭.৮%)। গাছপ্রতি ৩০০-৪০০টি ফল ধরে। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০ টন। বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পঞ্চগড়সহ দেশের সব অঞ্চলে চাষের জন্য উপযোগী।

বারি মাল্টা-২ : বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের মধ্য থেকে বাছাই করে মূল্যায়নের মাধ্যমে 'বারিলেবু-৪' জাতটি উদ্ভাবন করা হয় এবং ২০১৭ সালে জাত হিসেবে অনুমোদন করা হয়। বারি মাল্টা-২ একটি নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চফলনশীল জাত। ফল আহরণের সময় সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর। গাছ দ্রুতবর্ধনশীল, ঝোপালো স্বভাবের। পাতা উপবৃত্তাকার, পত্রফলকের অগ্রভাগ সুচালো ও গাঢ় সবুজ বর্ণের। ফুল সাদা, ছোট, উভলিঙ্গিক, পাঁচ (৫) পাপড়ি বিশিষ্ট। অনেকগুলো ফুল সাইম সাদৃশ্য পুষ্পমঞ্জুরিতে সাজানো থাকে। ফুলে পাঁচটি বৃত্যাংশ বিদ্যমান। ফল উপবৃত্তাকার ও তুলনামূলকভাবে বড়ো (প্রতি ফলের গড় ওজন ১৭৯ গ্রাম), ফলের উপরিভাগ মসৃণ, দেখতে সবুজ বর্ণের এবং টিএসএস ৭.৫%। ফল সাধারণত গুচ্ছাকারে ধরে। ফলের অভ্যন্তরে ১০-১১টি খণ্ড বিদ্যমান এবং খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৭২.৯৫%। ফলে ১১-১২টি পর্যন্ত বীজ বিদ্যমান।

উৎপাদন প্রযুক্তি :

জমি নির্বাচন ও তৈরি : সারা দিন রোদ পড়ে এবং বৃষ্টির পানি জমে না এমন উঁচু বা মাঝারি-উঁচু জমি মাল্টা চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত জমিটি পর্যায়ক্রমিক চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করে নিতে হবে। জমি থেকে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং আশপাশে উঁচু গাছ থাকলে তার ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি : সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা ষড়ভুজী পদ্ধতিতে এবং পাহাড়ি এলাকায় কন্টুর পদ্ধতিতে চারা/কলম রোপণ করা হয়। সাধারণত মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-ভাদ্র (মে থেকে আগস্ট) মাসের মধ্যে মাল্টা চারা লাগানো উত্তম। তবে পানি সেচ নিশ্চিত করা গেলে বছরের অন্যান্য সময়ও চারা লাগানো যেতে পারে।

মাদা তৈরি : চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে

প্রতি বছর মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য-চৈত্র (মার্চ) বর্ষার পূর্বে মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-জ্যৈষ্ঠ (মে) এবং বর্ষার পর মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসে তিন কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে সেচের ব্যবস্থা না

নির্দিষ্ট আকার দিতে হবে যাতে গাছ চারিদিকে ছড়াতে পারে। কারণ পার্শ্ব ডালগুলিতে ফল বেশি ধরে। কাণ্ডের এক মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সব ডাল ছাঁটাই করতে হবে। ডাল ছাঁটাই করার পর ডালের কাটা অংশে বর্দোপেস্টের প্রলেপ দিতে হবে। এ ছাড়া পানি তেউড় বা Water sucker উৎপন্ন হওয়ামাত্র কেটে ফেলতে হবে। মরা, শুকনা এবং রোগ ও পোকামাকড় আক্রান্ত ডালপালা কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে।

ফল পাতলাকরণ ও ব্যাগিং : বারি মাল্টা-১ এর গাছে প্রতি বছর প্রচুরসংখ্যক ফল আসে। সমস্ত ফল রাখা হলে ফল আকারে ছোট ও নিম্নমানের হয়। এজন্য প্রতি পুষ্প মঞ্জরীতে সুস্থ ও সতেজ দেখে দুটি করে ফল রেখে বাকিগুলো ছোট থাকা অবস্থায়ই (মার্বেল অবস্থা) ছাঁটাই করা দরকার। কলমের গাছ প্রথম বা দ্বিতীয় বছর থেকে ফল দিতে শুরু করে। গাছের বৃদ্ধির জন্য প্রথম বছর ফল না রাখাই ভালো, দ্বিতীয় বছর

গাছের বয়স (বছর)	গোবর সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	জিংক সালফেট (গ্রাম)	বরিক এসিড (গ্রাম)
১-২	১০-১২	২০০-৩০০	১০০-১৫০	১০০-১৫০	১০	৫
৩-৪	১২-১৫	৩০০-৪৫০	১৫০-২০০	১৫০-২০০	১৫	৮
৫-৭	১৫-১৮	৪৫০-৬০০	২০০-৩০০	২০০-২৫০	২০	১০
৮-১০	১৮-২০	৬০০-৭০০	৩০০-৪৫০	২৫০-৩০০	২৫	১২
১০ এর অধিক	২০-২৫	৭৫০	৫০০	৪৫০	৩০	১৫

উভয় দিকে ৪.০ মিটার দূরত্বে ৭৫ × ৭৫ × ৭৫ সেমি মাপের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ১৫ কেজি কম্পোস্ট বা পচা গোবর, ৩-৫ কেজি ছাই, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি সার এবং ২৫০ গ্রাম চুন গর্তের উপরের মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

চারা/কলম রোপণ : গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা/কলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে রোপণ করতে হবে। রোপণের পর খুঁটি দিয়ে চারা/কলমটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমতো পানি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ : গাছের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য সময়মতো সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। থাকলে বর্ষার আগে ও পরে দুই কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা ভালো।

আগাছা দমন : বর্ষার শেষে সার প্রয়োগের পর গাছের গোড়া থেকে একটু দূরে বিভিন্ন লতাপাতা বা খড় দ্বারা বৃত্তাকারে মালচ করে দিলে আগাছা দমনসহ শুষ্ক মৌসুমে আর্দ্রতা সংরক্ষিত হয়। সাধারণত বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে সম্পূর্ণ বাগানে হালকা চাষ দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

সেচ প্রয়োগ : ভালো ফলনের জন্য খরার সময় বা শুষ্ক মৌসুমে নিয়মিত সেচ দেওয়া একান্ত দরকার। বর্ষার সময় গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে সেজন্য দ্রুত পানি নিষ্কাশনের বন্দোবস্ত করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ : মাল্টা গাছের জন্য ডাল ছাঁটাই অপরিহার্য। গাছ লাগানোর পর ফল ধরার পূর্ব পর্যন্ত ধীরে ধীরে ডাল ছেঁটে গাছকে

অল্পসংখ্যক ফল রাখা যেতে পারে। এভাবে পর্যায়ক্রমে গাছের অবস্থা বিবেচনা করে ফল রাখতে হবে। ফলের বর্ণ সবুজ হওয়ায় পাখি ও পোকার আক্রমণ কম হয়। তবে পরিপক্বতার পূর্বে ব্যাগিং করলে অবাঞ্ছিত পোকা মাকড়ের আক্রমণ রোধ করা যায়।

ফল সংগ্রহ : ফল পূর্ণতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ফলের গাঢ় সবুজ বর্ণ হালকা সবুজ বা ফ্যাকাশে সবুজ হতে থাকে। বারি মাল্টা-১ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসে আহরণ করা হয়। পরিপক্ব ফল হাত অথবা জালিযুক্ত বাঁশের কোটার সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়। ফল সংগ্রহের পর আঘাতপ্রাপ্ত ও নষ্ট হওয়া ফলগুলো আলাদা করতে হবে। ভালো মানের ফলগুলো প্রয়োজনে গ্রেডিং করে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

- **প্রত্যয় কৃষি ডেস্ক**

নিরাপদ খাদ্য ও কিছু কথা

এ বি এম তাজুল ইসলাম

মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে খাদ্য হচ্ছে অন্যতম মৌলিক চাহিদা। জীবন ধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের জন্য প্রয়োজন নিরাপদ খাবার। বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন ১৯৯৬ অনুযায়ী 'কোন দেশে খাদ্য নিরাপত্তা তখনই আছে বলে মনে করা হয় যখন প্রত্যেক নাগরিকের সব সময়ের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির জন্য অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা থাকে যা তাদের সক্রিয় ও সুস্থ জীবন নিশ্চিতকরণের জন্য সঠিক পরিমাণ খাদ্যের চাহিদা পূরণ করবে।'

উপরিউক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী খাদ্যনিরাপত্তা বলতে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করাকে বোঝায় না বরং সেই উৎপাদিত খাদ্য যেন নিরাপদ, পুষ্টিসমৃদ্ধ ও সহজলভ্য হয় সেটাই মুখ্য। সহজ কথায় খাদ্যনিরাপত্তা বলতে বোঝায় একজন মানুষ বাজারে গিয়ে তার সামর্থ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য ক্রয় করতে পারবে। বাজারে প্রচুর খাদ্য দ্রব্যের উপস্থিতি আছে কিন্তু সব শ্রেণির মানুষের তা ক্রয় করার ক্ষমতা নেই, তাহলে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না। খাদ্যনিরাপত্তার সঙ্গে সাধারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতার বিষয়টি জড়িত।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা হয়তো উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি যেমন ধান ও সবজি উৎপাদনে, মৎস্য ও পশু পালনে ইত্যাদি, কিন্তু সেই উৎপাদিত খাদ্য কতটা নিরাপদ সেটা একটা বিরাট প্রশ্ন। আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি। কারণ এখনো মোট জনসংখ্যার প্রায় ২১.৮ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে, যারা দৈনিক ২২০০ কিলো ক্যালোরি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করার সুযোগ পান না, যা একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক খাদ্য চাহিদা।

পৃথিবীর বহু দেশ পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের সুযোগ না থাকায় খাদ্য উৎপাদন না করেও খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে, যেমন– মধ্যপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলসমূহের কথা বলা যায়। এসব দেশ প্রায় ৮০-৯০ শতাংশ খাদ্যশস্য আমদানি করে থাকে।

নিরাপদ খাদ্য :

সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য কিন্তু কিছু বিবেকহীন লোভী মানুষের কারণে বর্তমানে আমাদের দেশে রাসায়নিক ও ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাবার প্রাপ্তির বিষয়টি এখন অনেক কঠিন হয়ে গেছে। ফসল উৎপাদনে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও বালাইনাশকের ব্যবহার এবং খাদ্যে ভেজালের কারণে আমাদের জীবন ও জনস্বাস্থ্য এক ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন। অতিমাত্রায় কীটনাশকযুক্ত ফলমূল, শাকসবজি এবং ভেজাল খাদ্য গ্রহণের কারণে প্রতি বছর আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে লিভার সিরোসিস, ক্যানসার, কিডনি ফেইলিউর ও হৃদ্‌রোগে

আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় ৩ লক্ষ লোক ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছে, ২ লক্ষ লোক কিডনি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং প্রতি বছর ডায়াবেটিস আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হজার।

প্রত্যেক বালাইনাশকের প্রয়োগ-পরবর্তী এর বিষক্রিয়ার অবশিষ্ট প্রভাব (Pesticide residual effect) থাকে, যা বালাইনাশকের ধরনের ওপরের ভিত্তি করে তিন দিন থেকে তিন সপ্তাহ বা এর বেশি সময় পর্যন্ত থাকতে পারে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো আমাদের দেশের কৃষকদের বালাইনাশকের এই residual effect সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব সর্ম্পকে তারা তেমন সচেতেনও নয়। ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিক ফলন পাওয়ার আশায় কৃষক রোগ, পোকামাকড় দমনের জন্য কৃষি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ছাড়াই কীটনাশক বিক্রেতাদের কথামতো সবজি ও ফল ফসলে যথেচ্ছভাবে রাসায়নিক বালাইনাশক ও হরমোন ব্যবহার করছেন, এক্ষেত্রে অনেক দুর্বল প্রকৃতির পোকা দমনের জন্য কৃষক না বুঝেই অনেক শক্তিশালী কীটনাশক ব্যবহার করছেন, যার বিষাক্ততার মাত্রা এবং residual effect অনেক বেশি। উচ্চমাত্রার কীটনাশক প্রয়োগকৃত এসব ফলমূল, শাকসবজি খাদ্য হিসেবে গ্রহণের ফলে এসব রাসায়নিক এর ক্ষুদ্র অংশ প্রতিনিয়ত আমাদের শরীরে যোগ হচ্ছে এবং কয়েক বছরের মধ্যেই নিজের অজান্তেই ধীরে ধীরে আমরা ক্যানসার, কিডনি, লিভার সিরোসিস-সহ নানান রোগে আক্রান্ত হচ্ছি এবং শিশুদের ওপর এর প্রভাব আরো ভয়াবহ।

অনেক ক্ষেত্রেই কৃষক ফল বা সবজি বাজারজাতকরণের দু-এক দিন পূর্বে এমনকি বাজারে আনার আগের দিন পর্যন্ত ফসলে কীটনাশক প্রয়োগ করে থাকেন যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। বিশেষ করে, যেসব সবজি আমরা সালাদ হিসেবে কাঁচা গ্রহণ করি (টম্যাটো, শসা, কাঁচামরিচ, লেটুস) সেসব উপকরণে স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেক বেশি। যদি সালাদ উপকরণ, শাকসবজি বা ফলমূলে বালাইনাশকের residual effect থেকে থাকে (বর্তমান বাস্তবতায় থাকাটাই স্বাভাবিক) তাহলে খাওয়ার পূর্বে সচেতনভাবে কিছু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হলে কীটনাশকের প্রভাব প্রায় ৮০-৯০ শতাংশ কমানো যায়।

শাকসবজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সব সবজিতে একইভাবে Pesticide বা বালাইনাশক ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। কিছু কিছু সবজিতে কৃষকরা তেমন কোনো বালাইনাশক ব্যবহার করে না, আবার কিছু সবজিতে অল্প মাত্রায় বালাইনাশক ব্যবহার করে থাকেন এবং কিছু ক্ষেত্রে অতি মাত্রায় বালাইনাশক ব্যবহার করা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে Food Security বিষয়ে MS কোর্সে অধ্যয়নকালীন সময়ে কৃষক কোন ফসলে কী মাত্রায় বালাইনাশক ব্যবহার করে সে-সম্পর্কিত একটি গবেষণার তথ্য সংগ্রহের অংশ হিসেবে বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের সঙ্গে আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সবজিতে বালাইনাশক ব্যবহারের একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা এখানে প্রদান করা হল।

বালাইনাশক প্রয়োগবিহীন উৎপাদিত সবজিসমূহ : ধুন্দুল, কচু বা কচুজাতীয় সবজি, কলমি শাক, হেলেঞ্চা শাক, মিষ্টি আলু, শালগম, লেটুস ইত্যাদি। (প্রায় ৯৮ শতাংশ ক্ষেত্রে এসব ফসলে কৃষক বালাইনাশক ব্যবহার করে না)

স্বল্পমাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগকৃত উৎপাদিত সবজি : লাউ, মিষ্টিকুমড়া, চাল কুমড়া, ঝিঙা, কাঁচা পেঁপে, কাঁচা কলা, ডাঁটাশাক, পুঁইশাক, পালংশাক, লালশাক, পাটশাক, ধনেপাতা, মুলা, গাজর (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব ফসলে দু-তিন বার বালাইনাশক প্রয়োগ করা হয়)।

অতি মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগকৃত উৎপাদিত সবজি : বেগুন, শসা, শিম, করলা, বরবটি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রুকলি, টম্যাটো, কাঁচা মরিচ, আলু, পটোল, চিচিঙ্গা (এসব ফসলে ৫-১০ বার বালাইনাশক প্রয়োগ করা হয়)।

ফলের ক্ষেত্রে, লিচুতেই তুলনামূলক বেশি বালাইনাশক ব্যবহার করা হয় এ ছাড়া অন্যান্য সব ফলে মাঝারি মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে যার residual effect ভোক্তা পর্যায়ে আসার আগেই শেষ হয়ে যায়। তবে কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অধিক বাজার মূল্য পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের অপরিপক্ব ফল বিশেষ করে আম ও লিচু আগাম বাজারজাত করে থাকেন এবং কৃত্রিমভাবে ফল পাকানো ও ফলের রং আকর্ষণীয় করার জন্য ফলের মধ্যে ইথোফেন, কার্বাইড জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে থাকে। এ ছাড়া কলা বা পেঁপের রং আকর্ষণীয় করার জন্যও একই রকম রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। যদিও অসাধু ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফার আশায় এ ধরনের অনৈতিক কাজ করে থাকে, তবে তা স্বাস্থ্যের জন্য কীটনাশকের মতো এতটা ক্ষতিকর নয়, কারণ ইথোফেন ও কার্বাইড গ্যাসীয় পদার্থ যা শুধুমাত্র ফলের চামড়ার ওপরের রং পরিবর্তন করে কিন্তু ফলের চামড়া ভেদ করে ভেতরে যায় না, দ্বিতীয়ত এর residual effect ২৪-৩০ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হয় না। আমরা অনেকেই এ ধরনের আকর্ষণীয় রঙের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অধিক মূল্যে এ ধরনের অপরিপক্ব ফল কিনে থাকি কিন্তু এতে কখনো পরিপক্ব ফলের স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যায় না, তবে এতে পকেটের স্বাস্থ্য খারাপ হলেও শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার মতো কিছু থাকে না।

যে-কোনো আগাম শাকসবজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক বেশী বালাইনাশক ও হরমোন ব্যবহার করা হয়। তাই রসনা তৃপ্তির জন্য মৌসুমের পূর্বেই (গ্রীষ্মকালে উৎপাদিত শীতকালীন সবজি যেমন : ফুলকপি, বাঁধাকপি, টম্যাটো, পালং শাক, লাউ, শিম) বাজারে আসা শাকসবজি রান্নার পূর্বে কিছু সময় লবণপানিতে ভিজিয়ে রেখে রান্না করা উচিত। তা ছাড়া যে-কোনো ফলমূল বিশেষ করে খোসাসহ খাওয়া হয়, এমন ফল খাওয়ার পূর্বে এবং শাকসবজি রান্নার পূর্বে ১৫-২০ মিনিট লবণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে রান্না করা যায়, তাহলে এতে বিদ্যমান রাসায়নিকের প্রায় ৮০ শতাংশই লবণপানিতে দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং অবশিষ্ট রাসায়নিকও রান্নার পর আর তেমন বিদ্যমান থাকে না।

ফরমালিন: জানা অজানা কিছু কথা

ফরমালিন গত এক দশকে বাংলাদেশে ব্যাপক আলোচিত এক নাম তা এর পরিচিতি যতটা না গবেষণা কাজের জন্য বা শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য তার চেয়ে বেশি পরিচিত ফলমূল, শাকসবজি বা মাছ, মাংসে ব্যবহারের জন্য। তবে খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন বা ফরমালডিহাইড-এর ব্যবহার নিয়ে জনমনে কিছু ভুল ধারণা আছে, যেমন আমরা অনেকেই বলে থাকি, ফলে ফরমালিন দেওয়ার কারণে আপেল, নাশপাতি, মাল্টা জাতীয় ফল দিনের পর দিন ঘরে রেখে দিলেও শুকিয়ে যায় কিন্তু পচে না, শাকসবজিতে ফরমালিন দেওয়ার কারণে শাকসবজি বেশি সময় পর্যন্ত সতেজ

থাকে ইত্যাদি। কখনো কখনো ভ্রাম্যমাণ আদালত কৃর্তক পরিচালিত অভিযানে কিছু কিছু ফলে ফরমালিনের উপস্থিতি পাওয়া যাওয়ার কারণে এ বিষয়ে আমাদের ধারণা আরো পাকাপোক্ত হয়েছে।

খাদ্যবস্তুর ক্ষেত্রে ফরমালিন বা ফরমালডিহাইড শুধু প্রাণিজ উপাদান বা Protien Source ওপর কাজ করে কিন্তু কোনো উদ্ভিজ্জ উপাদানের ওপর (Carbohydrate source) ফরমালডিহাইড কাজ করে না। শাকসবজি ও ফলমূল যেহেতু উদ্ভিজ্জ উপাদান এবং কার্বোহাইড্রেট উৎস সুতারাং শাকসবজিকে দীর্ঘসময় পর্যন্ত সতেজ রাখার জন্য ফরমালিন ব্যবহারের কোনো উপযোগিতা নেই বরং ফল ও শাকসবজিতে ফরমালিন প্রয়োগ করলে এর স্বাভাবিক রং ও বর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাবে। তবে মাছ, মাংস যেহেতু প্রাণিজ উপাদান সেহেতু মাছ, মাংস দীর্ঘসময় পর্যন্ত পচনহীন রাখার জন্য ফরমালিন ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং অনেক অসাধু ব্যবসায়ী মাছে ফরমালিন ব্যবহার করে যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর তবে বর্তমানে সরকারের কঠোর নীতিমালা এবং নজরদারির কারণে মাছে ফরমালিনের ব্যবহার এখন অনেকটাই কমে গিয়েছে।

বাজার থেকে কিনে আনা ফল বিশেষ করে আমদানিকৃত বিদেশি ফল (আপেল, আঙুর, নাশপাতি, মাল্টা, ইত্যাদি) কেন সহজে পচে না, আপেলের গায়ে মোমের আবরণ ইত্যাদি টেনশন মাথায় রেখে এবং নানান আশঙ্কা মনে নিয়ে আমরা সবাই এইসব বিদেশি ফলমূল গ্রহণ করে থাকি কিন্তু এ বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা থাকলে আমাদের মনের শঙ্কা কিছুটা দূর হবে বলে আমার বিশ্বাস।

যে-কোনো কৃষিজাত পণ্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে রপ্তানি করতে হলে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী কিছু নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হয়, যা বিশ্বব্যাপী CODEX নামে স্বীকৃত। আমাদের দেশে যেসব বিদেশি ফল আমদানি করা হয় তা রপ্তানিকৃত দেশ হতে প্যাকিং করার পূর্বে ফলের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন ক্ষুদ্র অণুজীব ধ্বংস করার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফল শোধন করার পর অনুমোদিত মাত্রায় ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করে ফুড গ্রেড মোম দ্বারা আবরিত (Wax coated) করা হয়, যার ফলে বাহ্যিকভাবে ফলের মধ্যে কোনো ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে না, যতক্ষণ না ফলের গায়ে কোনো ক্ষত সৃষ্টি হয়। এ কারণে আমদানিকৃত ফলের সংরক্ষণ সময় বা Shelf-life বেশি হয় এবং তা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সতেজ থাকে তবে ফলের গায়ে কোনো ক্ষত হলে বা আঁচড় লাগলে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়ে ফলে পচন শুরু হবে আর না হলে প্রতিনিয়ত শ্বসনক্রিয়ার কারণে ফল ধীরে ধীরে কুঁচকে যাবে। যেহেতু এক্ষেত্রে CODEX অনুসরণ করেই সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় সুতরাং তা নিরাপদ ফল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

শাকসবজি ও ফলে প্রকৃতিগতভাবেই কিছু ফরমালডিহাইড থাকে যা সবজি ও ফলকে দ্রুত পচন থেকে রক্ষা করে এবং ফলের Shelf-life কার্যকর রাখে, এটা প্রকৃতির দান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে প্রাকৃতিকভাবেই প্রতি কেজি ফল ও শাকসবজিতে ৩-৬০ মিলিগ্রাম, প্রতি লিটার দুধে ১ মিলিগ্রাম, প্রতি কেজি মাছ বা মাংসে ৬-২০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত ফরমালিন থাকতে পারে (WHO, ২০০০)। গাছ থেকে কোনো পরিপক্ব পাকা ফল সংগ্রহ করার পর ফরমালিন কিটে পরীক্ষা করলে এতে কিছু ফরমালিনের উপস্থিতি পাওয়া স্বাভাবিক, তাই বলে সবজি বা ফলের মধ্যে ফরমালিন মিশিয়েছে, এমন ধারণা করা সঠিক নয় তবে কীটনাশকের উপস্থিতি পাওয়া গেলে তা প্রকৃতির দান বলে মনে করার কোনো কারণ নাই।

খাদ্যনিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্যবিষয়ক আলোচনার ব্যাপ্তি অনেক বড়। এখানে শুধু আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যবস্তুকে (ফলমূল, শাকসবজি) নিরাপদ খাদ্যে পরিণত করার বিষয়ে আমাদের করণীয় এবং খাদ্যে ফরমালিন এর ব্যবহারবিষয়ক কিছু ধারণা অতি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, যা হয়ত আমাদের কিছুটা সচেতন করবে এবং কিছু শঙ্কা দূর করতে সাহায্য করবে। সুস্থ জীবন ও পারিবারিক সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নিরাপদ খাদ্যের কোনো বিকল্প নেই।

• **লেখক**, সহকারী কর্মকর্তা, কৃষি, বুরো বাংলাদেশ

প্রত্যয় সাহিত্য

ছোটগল্প

কলিকাহন

আফরোজা পারভীন

কলির মাঝে মাঝে এক দৌড়ে পেছনে চলে যেতে ইচ্ছে করে। ছেলেবেলায় পেছনে হাঁটত তারা। এটা ছিল এক ধরনের খেলা। সে খেলা খেলা যেত তখন। এখন আর ইচ্ছে করলেই পেছনে হাঁটা যায় না। জীবনে কোনো রিওয়াইন্ড বাটন নেই যে সামনে পেছনে করা যাবে। করা গেলে কলি ফ্রক দোলানো, বেণি ঝোলানো বালিকা হয়ে যেত। যে বালিকার চোখে ছিল অপার বিস্ময়, নিত্য আবিষ্কারের খেয়াল আর জীবনকে ভালোবাসার দ্যুতি।

কলি ভালোবাসত গাছ, ফুল, পাখি, নদী, কবিতা। আজও বাসে। লুকিয়ে কবিতা লিখত। কোথাও গাছ পেলে এনে পুঁতে দিত উঠোনের কোণে। ফুল ফুটলে অপলকে চেয়ে থাকত। কে সেই কারিগর যিনি তৈরি করেন এমন একটি নিটোল ফুল যার রং ধুলেও ওঠে না! আর পাঁপড়িতে কী ব্যঞ্জনা। যেন এক একটি পাঁপড়ি একটি করে কবিতা।

কলি কবিতা লিখত, শোনানোর লোক পেত না। কবিতা শোনাতে চাইলেই দৌড়ে পালাত সবাই। এসএসসি পরীক্ষার আগে আচমকা একদিন পেয়ে গেল সেই লোক, লোক নয়, বালক। ঠিক বালকও নয়, বয়ঃসন্ধিতে আছে ওরই মতো। বড়ো ভাবির ভাই, বেড়াতে এসেছে। কলিকে একদিন সিঁড়িঘরে লুকিয়ে কিছু লিখতে দেখে পেছন থেকে আচমকা বলে উঠল,

‘কী লিখছ লুকিয়ে লুকিয়ে, প্রেমপত্র বুঝি?’

হাত থেকে খসে পড়ল কাগজ-কলম। কাঁপুনি উঠল পায়ে। শুনেছে সে, বন্ধুরা কেউ কেউ প্রেমে পড়েছে। প্রেমপত্রও নাকি লিখছে! লজ্জা লজ্জা! ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করে কী করে। কী লেখে, কী বলে!

‘কী হলো বললে না কী লিখছ? না বললে কিন্তু কেড়ে নেব।’

ও কেড়ে নিতেই পারে। খুবই দুষ্টু আর বেয়াড়া। ঢাকায় থাকে, চটপটে শুধু না-পাকা। সবকিছু শিখেছে আগে আগে। এ কথা আপা প্রায়ই বলে।

মৃদুস্বরে কলি বলে, ‘কবিতা।’

‘তাই বলো। তা তুমি কবিতা লেখো নাকি? শুনতে পারি তোমার কবিতা?’

অন্য সময় কবিতা শোনানোর জন্য পাগল হলেও একে শোনাতে লজ্জা করে। শুনে কী না কী বলবে।

‘না না কিছু হয়নি। আমি পারি না। চেষ্টা করি।’

কলি দৌড়ে পালাতে গিয়েছিল। খপ করে চেপে ধরেছিল ওর বেণি ওই ডেঁপো ছেলেটা।

কী আর করা। কাঁপা কাঁপা গলায় কবিতা শুনেয়েছিল কলি। মন দিয়ে শুনেছিল সে। নিবিড় শ্রোতা যেন। তারপর বড়ো মানুষের মতো বলেছিল, ‘ভালো হয়েছে, বেশ ভালো। কাল আমাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখবে। মনে থাকবে তো?’

কথা বলেনি কলি। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল।

'কী হলো বললে না, লিখবে কি না? না লিখলে কিন্তু খবর আছে তোমার।'

এমনভাবে তাকিয়েছিল যে রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল কলির। ও ছেলে খবর করতেই পারে। বয়সের তুলনায় পাকা ও। অনেক কিছু জানে। কোনো বাধা মানে না। হয়তো জাপটে ধরবে কলিকে।

সেদিন কবিতা লিখতে বসে অদ্ভুত এক ঘোর লেগেছিল কলির মনে। ও অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল আধভাঙা চাঁদের দিকে, উঠোনের আধফোটা ফুলের দিকে। সব এখন আধা আধা, পূর্ণ হবার অপেক্ষায়। চোখে ভেসেছিল ওর ধবল মসৃণ ত্বক, সুচারু নাক, ভাসা ভাসা চোখ! আর গলার স্বর কী দারুণ! মা বলেন, 'যার চোখ ভাসা ভাসা সে মানুষ ভালো।' ও কি মানুষ ভালো? ভালো নিশ্চয়ই নাহলে কলির অমন পচা কবিতা মন দিয়ে শুনল কেন?

পরদিন সকালেই বারান্দায় মুখোমুখি ছেলের। 'তুমি কবিতা লেখোনি?'

'লিখেছি।'

'এই তো লক্ষ্মী মেয়ে।'

ভাবখানা এমন যেন উনি কত বড় একটা মানুষ। ছোট্ট একটা মেয়েকে লক্ষ্মী বলছে। কলি মনে মনে ভেচিং কেটেছিল।

'তাহলে শোনাও। কবিতা শুনব বলে সারা রাত ঘুম হয়নি।'

কী বলে এই ছেলে! অদ্ভুত তো!

আবারও সিঁড়িঘর আর কাঁপা কণ্ঠের কবিতা।

মন দিয়ে আবার শোনে। বলে, 'দারুণ হয়েছে। কাগজ কলম দাও, তোমাকে লিখে দিচ্ছি একদিন রবীন্দ্রনাথের মতো বড় কবি হবে। না না, তুমি তো মেয়ে। মেয়েদের মধ্যে মস্তবড় কবি কে বলো তো? তার মতো হবে।'

'যাহ্'

এরপর এদিক-ওদিক তাকায় ওই ছেলে। তারপর বলে, 'কাল কবিতা নয়, আমাকে একটা প্রেমপত্র লিখবে। এবার আমরা প্রেমে পড়ব। মনে থাকবে?'

'না না প্রেম করে বড়রা। প্রেম করা খারাপ।'

'শোনো আমরাও বড়। এই তো সামনেই এসএসসি পরীক্ষা, তারপর কলেজ। আগের দিনে ছেলেরা এই বয়সে বিয়ে করত, জানো। আর মেয়েদের বিয়ে হতো বারো বছর বয়সে। আমার মায়েরও হয়েছিল। প্রেমপত্র কিন্তু চাই।'

প্রেমপত্র লিখেছিল কলি। না লিখে উপায় ছিল না। মন চাইছিল ওর। ওই ছেলেও উত্তর দিয়েছিল। আর লিখতে লিখতে একসময় দুজনই বুঝেছিল প্রেম কাকে বলে। তারপর একদিন কোর্ট বিল্ডিংয়ের ছাদে ঘন হয়ে বসেছিল ওরা। আর একদিন পালতোলা নৌকায় চিত্রার বুকে, উদ্দাম হাওয়ায়। ওই ছেলে যার নাম ফরিদ ওর কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল। আর কী করতে হবে বোঝেনি ওরা। অথবা বুঝেও তুলে রেখেছিল আগামীর জন্য। তবে চোখে চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল।

এর পরদিন ওই ছেলে চলে গেল তার বাড়িতে। আপা লম্বা একটা শ্বাস ফেলে বললেন, যাক বাঁচা গেল!

ফরিদ কলির নাম দিয়েছিল 'বন্যা' আর কলি ওর নাম দিয়েছিল 'সাগর।' আরো বড় হয়ে কলি জেনেছে ওই বয়সে যারা প্রেম করে তারা বেশিরভাগ এই নামই দেয়। সম্ভবত প্রেমিকরা 'শেষের কবিতা' পড়ে প্রেমিকার নাম

লাবণ্য অথবা কলি যা-ই হোক না কেন, নামকরণ করে ফেলে 'বন্যা।' কিন্তু সাগর নামের কোনো ব্যাখ্যা নেই। কলি তখন সদ্য 'উপল উপকূলে' পড়েছে। তাই সাগরের কথাই তার মনে হয়েছিল। কলির জীবনে নতুন অধ্যায় শুরু হয়। ও নতুন করে পড়ে বারবার পড়া কবিতা। নিজে হয়ে যায় সব কবিতার নায়িকা।

দেশে তখন রাজনৈতিক ডামাডোল। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিলেন। আজ কারফ্যু তো কাল ব্লাক আউট। এমন সময়ে একদিন প্রেমপত্র এলো। অনেক আবেগঘন কথা লেখার পর সাগর জানাল, 'আসছি কাল।'

কলির মনে উৎসবের আমেজ। ও সিনেমা টিভিতে দেখেছে প্রেমিকের কাছে যাবার আগে মেয়েরা শাড়ি পরে, সুন্দর করে সাজে। কলি আগে শাড়ি পরেনি। কিন্তু প্রেমে পড়েছে যখন শাড়ি পরতে হবে, চুলে গুঁজতে হবে ফুল। কলি মায়ের অর্ধশতবর্ষী ট্রাংক খুলে অনেক যত্নে পাট করে রাখা একটা লাল জর্জেট ক্ষীণ শরীরে জড়াল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে কেমন পাটকাঠি পাটকাঠি মনে হলো। খুলে ফেলবে নাকি! কিন্তু না, সাগর একবার লিখেছিল, শাড়ি তার পছন্দ। তার পরও সাজ সম্পূর্ণ হলো না। বেণিতে গোঁজার জন্য কোনো ফুল খুঁজে পেল না কলি। বাড়িতে এত ফুল। যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে যেন ফুটতে ভুলে গেছে ওরা। হয়তো আছে দেশ স্বাধীনের অপেক্ষায়!

বড় বোন আড়চোখে দেখতে লাগল কলির সাজগোজ। একবার কলিকে শুনিয়ে বলল, 'ফরিদ ছেলেটা বড্ড ডেঁপো। এ ধরনের ছেলেদেরই বলে বখাটে, এঁচড়ে পাকা।' কলি গায়ে মাখল না। বইপত্র পড়ে আর আশপাশের দু-চারটে প্রেম দেখে ততদিনে সে জেনে গেছে, গার্ডিয়ানরা কখনো প্রেমকে ভালো চোখে দেখে না। সে যত ভালো ছেলে আর ভালো মেয়েই হোক।

সাগর এলো। কলি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল বড় বোনের কঠিন দৃষ্টি উপেক্ষা করে। কলির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সাগর। তারপর বলল, 'কী সুন্দর যে তোমাকে লাগছে দেখতে। ঠিক কবিতার মতো! তা ফুল পরোনি কেন?'

কলি লজ্জিত মুখে বলল, 'পাইনি।'

'তাই বলো, জানতাম পাবে না। এই নাও। না না আমিই পরিয়ে দি।'

বেণির গোড়ায় গুঁজে দিল ফুল। কলির মনে হলো হাজার বীণার তার বেজে উঠল একসঙ্গে। ও তাকিয়ে রইল নির্নিমেষ।

শুরু হলো যুদ্ধ। আর শেষ হলো সাগর-বন্যার ইতিহাস। যুদ্ধে বন্যার বড় ভাই শহিদ হলেন। আর বড় ভাইয়ের বউ ছিলেন সাগরের বোন। তিনি আবার বিয়ে করলেন যুদ্ধের মধ্যেই। দুই পরিবারের বন্ধন ছিন্ন হলো। তার পরও চেষ্টা করেছিল সাগর-বন্যা। চিঠি লিখেছিল অনেকগুলো দুজন দুজনকে। সাগরের একটা চিঠিও বন্যার হাতে পৌঁছেনি। আর দেখা করতে এসে বাড়ির সামনে অনেক অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেছে সাগর। চোখের কঠিন পাহারায় বেঁধে রাখা হয়েছে বন্যাকে যেন সে বাইরে যেতে না পারে। বিচ্ছিন্ন হলো সাগর-বন্যা। ফুল ফোটার আগেই ঝরে গেল।

তার পরও জীবন এগিয়ে চলল। কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে জামানের সঙ্গে শুরু হলো ডিবেট কমপিটিশন। জামান কলেজের সবচেয়ে সুদর্শন অর মেধাবী ছেলে, তুখোড় বক্তা। তার নাম সবার মুখে মুখে। কলিই-বা কম কীসে। সেও ভালো ছাত্রী। তারও আছে ডিবেটের একাধিক রেকর্ড। সুতরাং মুখোমুখি দাঁড়াল দুই ক্যাপটেন। আর আশ্চর্য হয়ে সারা কলেজ দেখল, জামান কলির যুক্তির পাশে দাঁড়াতেই পারল না। দলের অন্যান্য অংশীজন চেষ্টা করেও হার থামাতে পারল না। ক্যাপটেন যদি তো তো করে জিতবে কী করে দল। জামানের হার হলো ডিবেটে। তবে জিতে নিল কলির অন্তর।

জামানের আর্থিক অবস্থা ততটা ভালো না। একটা টিনের ঘরের বারান্দা ঘিরে ছোট্ট একটা ঘর বানানো হয়েছে। সেখানেই সে থাকে। সে ঘরের দেওয়ালে থরে থরে সাজানো নিউটন এডিসন আর্কিমিডিস আরো কত বৈজ্ঞানিকের ছবি। ওদের নাম কলি জানে না। ও ঘরে কলির অবারিত যাতায়াত। কলি একদিন জানতে চাইল,

'তোমার ঘরে কবি-সাহিত্যিকের কোনো ছবি নেই কেন? তুমি কবিতা পড়ো না?'

'আরে বিজ্ঞান পড়েই সময় পাই না। কবিতা পড়ব কখন। তবে হ্যাঁ, ডিবেট করার জন্য দরকার হলে পড়ি। অকারণে পড়ে লাভ কী?'

বিজ্ঞানের সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই কলির। কিন্তু কবিতা! কবিতা যে দুঃসময়ের সঙ্গী একাকিত্বের দোসর। যে কবিতাকে সাথি করতে পেরেছে সে জীবনে অনেক কিছু পেয়েছে, অনেক।

অনেক অনেক কবিতার বই জামানকে উপহার দিল কলি। বলল,

'এগুলো পড়বে। কবিতা পড়লে দেখবে তুমি অন্য মানুষ হয়ে গেছ।'

কলেজ শেষ করে মেডিক্যাল কলেজ। অনেক অমিলের মাঝেও দুটিতে মানিকজোড় যেন। রাতে বসে দুজনে স্কেলিটন আর ভিসেরা পড়ে। জামান কলিকে পড়ায়। মেডিক্যালের পড়া কিছুই ঢোকে না কলির মাথায়। বাড়ির চাপে পড়তে এসেছে ঠিকই কিন্তু খাপ খাওয়াতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে তার। ভাগ্যিস জামান আছে!

জামানের সঙ্গে পড়তে বসে কলি আনমনা হয়ে যায় মাঝেমাঝে। ভাবে, আশপাশে তো কেউ নেই। আশ্চর্য জামান কেন ওর হাতটা ধরে না, ওকে কাছে টানে না, ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ায় না!

পথে যেতে যেতে জ্যামে দাঁড়িয়ে পড়ে রিকশা। ফুলওয়ালি ওদের সামনে বাড়িয়ে ধরে বেলিমালা, গোলাপ। জামান তাকিয়েও দেখে না। কখনো বলে, 'যাও সরো।' অনর্গল বলে যায় মেডিক্যালের কঠিন কঠিন বিষয়গুলো। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের খুঁটিনাটি। কলির মন চায় জামানের কাঁধে মাথা রাখতে। রাখেও দু-একবার। জামান সরিয়ে দেয়, 'করছ কী! লোকে দেখছে, এটা রাস্তা।'

কলি মনে মনে বলে, 'তুমি তো ঘর পথ সব একাকার করে ফেলেছ জামান। তুমি কি জানো নির্জনতা কাকে বলে? কাছে পাওয়ার আনন্দ জানো তুমি? কখনো ফুলের সৌরভ নিয়ে দেখেছ, ছুঁয়ে দেখেছ পাতার শরীর, বৃষ্টি মেখেছ গায়ে?'

কলির রোমান্টিকতা জামানের বাস্তবতার গায়ে ধাক্কা খায়। কলি জামানের পাশে বসে একা হয়ে যায়। তার পরও সে জামানকে ভালোবাসে গভীরভাবে। সে ভালোবাসার কোনো ব্যাখ্যা নেই।

বিদেশে স্কলারশিপ পেল জামান। অনেক বলেছিল কলিকে সঙ্গে যেতে। যায়নি কলি। জামান সাফ জানিয়ে ছিল, ওখানেই থেকে যাবে। ফিরবে না

এদেশে। কলির সামনে অপশন, হয় জামান নয় দেশ। দেশকে বেছে নিয়েছিল কলি। এ দেশ, এ মাটি ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। এ দেশে আছে মা, বাবা, শহিদ ভাই, গৌরবের ইতিহাস। এ দেশের নদী দিয়ে যে স্রোত বয়ে চলে সেটা তার নিজের, যে ফুল গন্ধ ছড়ায় সেটাও নিজের। আর যে আকাশ ছায়া দেয় সেটাও একান্ত নিজের। যে দেশে কবি ফিরতে চায় মানুষ না হলেও শঙ্খচিল শালিখ হয়ে সে অপরূপা দেশ ছেড়ে কোথায় যাবে সে!

এরপর অনেকেই কাছে আসতে চাইল। সহপাঠী, সদ্য ডাক্তার, বন্ধুবান্ধবের ভাইয়েরা। নিঃসঙ্গ কলি নিজেও সঙ্গ চাইল। ভাবল, প্রেম ভালোবাসা একজন মানুষের মনে অফুরন্ত জমা থাকে। নতুন করে জন্মও হয় প্রতিনিয়ত। একজনে তা ফুরোয় না। আর অন্যজনকে ভালোবাসলে আর একজনের তাতে কমতিও হয় না। সে একা। একজন সাথি হলে বেশ হয়। যে তাকে কবিতা শোনাবে, গানের কলি আওড়াবে, খোঁপায় গোঁজার ফুল এনে বলবে, 'তোমার জন্য আনলাম।' কিন্তু না, টাকা আনা পাই, এফসিপিএস, এমআরসিপি, ক্যারিয়ারের হিসেবের বাইরে কাউকে পেল না কলি। এমন কাউকে পেল না যার মনের ঘুলঘুলিতে দখিনের বাতাসের আকাঙ্ক্ষা আছে!

ডাক্তার হলো কলি। বেশ নামকরা ডাক্তার। চিকিৎসার সঙ্গে যখন অন্তরের ভালোবাসা যোগ হয় তখন সেটা হয় প্রকৃত চিকিৎসা। সেটাই চেষ্টা করে কলি। সময় গড়াল। বিয়ের প্রচণ্ড চাপ। মা বললেন, 'তোর বয়স চলে যাচ্ছে মা। তুই কি আমাকে একটু শান্তিতে মরতে দিবি না।' বাবা তো মেয়ের বিয়ে মেয়ের বিয়ে করে অস্থির হয়ে চলেই গেলেন। প্রস্তাব আসতে থাকল একের পর এক। কলি মনস্থির করতে পারল না। সে জানে না, বিয়ে মানে কী। বিয়ে মানে কি খোঁপায় গোঁজা ফুল, কবিতা, নাকি কঠোর বাস্তবতা। ভয় পেল কলি। নিজের বিশ্বাস, ভালোলাগার সঙ্গে আপস করতে শেখেনি সে। তাই এই বেশ, বিয়ে নয়।

মাঝে মাঝে খারাপ লাগে। একাকিত্বে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়তে চায়। মনে পড়ে একদিন কবিতা লিখত। কবিতার খাতায় আঁকিবুকি কাটে। মেলে ধরে রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ। ওদের কাছে ফিরতে চায়। বারন্দায় রাখা গাছপালাকে আদর করে, ওদের আহার আর পানি দেয়। একসময় মনে হয় ও আর একা নয়। সঙ্গে আছে কেউ। তবু যেন কোথায় সঙ্গোপনে একটু ক্ষীণ হাহাকার গুমরে মরে, যা সে বলে না কাউকে। ওকে বুঝল না কেউ, ওর চাওয়া না চাওয়াকে মূল্য দিল না কেউ!

একদিন ডিউটিতে থাকা অবস্থায় কলি জানতে পারল, ফিমেল ওয়ার্ডে কেউ একটা সদ্যজাত শিশুকে ফেলে রেখে চলে গেছে। শিশুটা তারস্বরে কাঁদছে। তার কোনো আত্মীয়স্বজন পাওয়া গেল না। ছুটে গেল কলি। অনেক খোঁজখবর করল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। লাভ হলো না। কলি শিশুটিকে নিয়ে এলো নিজের বাড়িতে। থানায় জিডি করল, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিল। কোনো দাবিদার জুটল না। শিশুটা রয়ে গেল কলির কাছে। কলি ওকে বুকে তুলে নিল। নাম দিল কাঁকন। ওর দিন রাতে অনেকটা সময় এখন কাঁকনের জন্য বরাদ্দ। কাঁকন বসতে শিখল, হাঁটল। আর একদিন কলিকে অস্ফুটে ডাকল 'মা'। কলির চোখে বন্যা নামল সব পাওয়ার আনন্দে। এখন কাঁকনই কলির অস্তিত্ব। কলি ওকে নামকরা স্কুলে ভর্তি করাল। টিচার রেখে গান শেখাল। সকালে ওকে স্কুলে দিয়ে হাসপাতালে যায়। বিকেলে ওকে বাসায় নামিয়ে বুয়াকে বারবার ওর খেয়াল রাখার কথা বলে যায় চেম্বারে। একদিন কাঁকন বলল, 'মা তুমি অত রাত করে বাড়ি ফিরো না। তোমার শরীরের ক্ষতি হবে। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে।' কলি রাত করে বাড়ি ফেরে বলে নয়, ওর শরীরের ক্ষতি হবে বলে কাঁকনের দুশ্চিন্তা। আশ্চর্য কেউ একজন ভাবছে তার কথা!

আর একদিন কাঁকন ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'অত খাটতে হবে না তোমাকে। আমরা মাত্র দুটো মানুষ। আমাদের অত কিছু চাই না।'

আশ্চর্য এই মেয়ে এত অল্প বয়সে এত ভারী ভারী কথা শিখল কী করে। ও কিছুই চাইছে না, চাইছে কলিকে!

সেদিন হাসপাতালে একটা ইমার্জেন্সি রোগী ছিল, আটকে গেল কলি। কাঁকনের স্কুলের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। নিরুপায় কলি বুয়াকে ফোন করে বলল, 'গাড়ি পাঠাচ্ছি, স্কুল থেকে কাঁকনকে নিয়ে এসো সাবধানে।'

অনেক রাতে বাড়ি ফিরল কলি। আর তখনই ঝুম বৃষ্টি নেমে ঘন আঁধারে ঢেকে দিল একটু আগে চাঁদের আলোর বানে ভাসা চারদিক। কলি বন্ধ জানালার কাচ দিয়ে নিকষ আঁধারে তাকিয়ে ফিরে গেল তার শৈশব-কৈশোরে। একটা লাল শাড়ি, কবিতা, একগোছা ফুল তাকে দোলাতে লাগল। সে দুলুনি বন্ধ করে দিল নিউটন এডিসন আর্কিমিডিস অ্যানাটমি ফিজিওলজি, ভিসেরা স্কেলিটন। কেমন যেন গা গুলোতে লাগল কলির। চোখ ভরে কান্না এলো। আর তখনই পদশব্দ শুনল। গুটি গুটি পায়ে ঘরে এলো কাঁকন। ওর পেছনে লুকানো দু'হাত।

সলজ্জ মুখে বলল, 'মা তোমাকে একটা কথা বলব। রাগ করবে না তো?'

মেয়ের এমন লাজমাখা মুখ কমই দেখেছে কলি। বলল, 'কেন রে, রাগ করব কেন? কী করেছিস?'

'আমি একটা কবিতা লিখেছি।'

কলির বুকে চিত্রার উথাল পাথাল। 'বলছিস কী তুই! কবিতা লিখেছিস। কই দেখি দেখি!'

'তুমি শুনবে?'

'অবশ্যই।'

কাঁকন পেছন থেকে সামনে আনল এক হাত। একটা খাতা মেলা হাতে। বলল, 'পড়ি?'

কবিতা পড়ল কাঁকন। কলি জড়িয়ে ধরল ওকে। আর জড়িয়ে ধরেই বলল, 'তোর মাও ছেলেবেলায় তোর মতো কবিতা লিখত, জানিস। এখন সে কবিতা হারিয়ে গেছে।'

'তো ফিরিয়ে আনো।'

'এবার ঠিক ফিরবে দেখিস। কিন্তু তোর পেছনে কি লুকিয়ে রেখেছিস বলত? আরো কবিতা আছে বুঝি?'

এবার কাঁকন সামনে নিয়ে এলো বাকি হাতটা। সে হাতে ধরা একগাছি বেলি ফুলের মালা।

'তোমার জন্য আনলাম মা। রাগ করবে না কিন্তু। বুয়াকেও বকবে না। ওকে বললাম, 'গাড়ি থামাও, মার জন্য ফুল নেব। ও শুনছিল না। ড্রাইভার ভাইও না। কিন্তু আমি...' বলতে বলতে মালাগাছি জড়িয়ে দিল কলির বেণির গোড়ায়।

এখন কলির বুকের মাঝে জড়ানো কাঁকন। কলির চোখে জলের বন্যা। এ বন্যা বুঝি গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাবে হারানো কোন সাগরে!

কবিতা

রন্ধনজীবন

হাবীবুল্লাহ সিরাজী

পিতামহ ভুল ক'রেছিলেন কি না তা অজ্ঞেয়
কিন্তু পিতা যে ভুলে ছিলেন এতে সন্দেহ নেই
এবং আমিও তো সেই পথে হেঁটেছিলাম
সন্তানেরা এখন বোঝে না
তারাও তাদের মতো ভুলে থাকে
দক্ষিণে রন্ধনশালা...
ভুলের পিছনে গা ঘেঁষে অপেক্ষমাণ শুদ্ধ
সামান্য ফাঁক পেলেই সম্মুখে দাঁড়াবে
তা তো হবার নয়
ভুলেরা যে ভাই-ভাই জলপাই
টুপি ও কার্তুজের রোশনাই
উত্তরের রন্ধনশালা...

চারপুরুষের এস্তেমাল
ভুলে আর ভুলে খোলেনি সে দ্বার
অসহায় শুদ্ধ তাই অন্ধ ছায়ামালা
ও আমার চাল-ডালে নিদ্রাতুর ঘর
আগুন ও জলেই তো রন্ধনজীবন!

আমার আকাশ

মাহবুব হাসান

আকালের নীল প্ররোচিত করছে আমাকে,
আমি উড়ে যাই মুহূর্তেই
রোদে মাখা অনন্ত আকাশ আমাকে নাচায় তার শয্যায়।

আমি স্বপ্ন থেকে জেগে উঠি।

গোত্তা খাওয়া বোধ শিশুবেলায় নামে। যেন সে
পাখি, তার কোনো ডানা নেই, আছে ভাবনার
নিরাকার চেতনারাশি!

সে আমাকে বিছানা থেকে টেনে তোলে। যেন সে
নিথর কোনো নীলিমা!
আমি ঘুড়ির মতো গোত্তা খাই। নেমে আসি
ইস্ট রিভারের চঞ্চল অভিমানে। তাকে ভেঙে দিই মন যেমন
ভেঙে দেয় আমাকে রোজ একবার।

আমার আকাশ যখন কাঁদায়
আমি মনের গহনে নেমে গোত্তা খাই নীলিমার জ্যোৎস্নালোকে।
আলো আমাকে নাচায়। আমি বজ্রবিদ্যুতের ভয়ে মহাকাশে
নির্মাণ করি পরমাণু-বিম, আলোর প্রপাত!
পরমাণু যুদ্ধের আরেক প্রকল্প আমার!
হায় প্রভু তুমি তো চোখেও দেখো না!
তুমি কি দৃষ্টিহীন অবাক পৃথিবী?

মনোবৈষয়িক সম্পদ আমার
হাটের পণ্য নয় যে
ডলারের বিনিময়ে বিক্রি করে দেব যুদ্ধবাজের কাছে; আমি
অতটা অমানুষ নই যে মানুষকে বাস্তুচ্যুত করে সুখ পাব।
ময়ূরপঙ্খি নাও ভাসিয়ে আকাশে হাওয়া খাব দুঃখী জীবনের
বুকের ওপর চড়ে, তেমন বর্বর নই আমি
ইতিহাসের পাতার বর্বরদের কবর রচনা করি আমি মৃত্তিকায়।
তোমরা দেখতে পাও না, কেননা তোমাদের চোখ নেই। চোখ
দেখবার জন্য বটে, তা তো নিখিলেরই সহোদর! তা কি
জানো?
আমি রোজ সেই চোখের সরোবরে গা ধুয়ে পবিত্র হই। পবিত্র
শব্দটি আঁকার সর্বস্ব নয়, নিরাকার!
যেন সে মালিক এ জগৎ সংসারের।

আমি সবকিছু ভেঙে দিয়ে একদিন নীলিমা হব।

দিদিমণি, আমি বাড়ি যাব

সৌমিত বসু

আর আধঘণ্টা পরে ডেকে উঠবে অসংখ্য মোরগ
দিদিমণি, আমি বাড়ি ফিরে যাব।
আমার পিঠ বেয়ে নেমে আসা লাল পিঁপড়েরা
উলটোনো শুকনো পাতায় জমে থাকা জলে
শুঁড় বুলিয়ে লিখে রাখছে আমার মৃত্যুগাথা।
দিদিমণি, আমি বাড়ি ফিরে যাব।

সারা রাত জেগে আছি যদি কানে ভেসে আসে সাগরের ঢেউ।
ভোরের কুয়াশা মেখে কারা যেন ফিরে গেল
অলৌকিক ভয়ের ভেতর। গনগনে উনুনের দিকে
পিঠ দিয়ে বসে আছি যদি আসে তুষার রায়ের মতো
কোনো সরীসৃপ, নখ দিয়ে চিরে দেবে কবিতার ত্বকের হলুদ।
এই দেখো আবার উঠেছে জেগে উর্ধ্বমুখী লাল নীল ফিতে
ওরা তুলে নিয়ে যাবে কালো কাচ গাড়ির ভেতর
অসহ্য আকাশ জুড়ে লাট খায় মরা চিল, মায়াবী শকুন
নখে বেঁধা তীব্র উল্লাস কীভাবে ছড়িয়ে যাবে সীমানা পেরিয়ে,
তুমিও জানো না।
ভয়ার্ত চোখ নিয়ে শুধু বসে থাকা, ওই বুঝি ধুলোঝড় এলো
দিদিমণি, যদি আজ না বাঁচাও,
মরে গিয়ে জন্ম নেব তোমার কোলেই, তুমি দেখে নিয়ো।

আজ ঠিক মাঝরাতে ডেকে উঠবে অসংখ্য মোরগ
আমি বাড়ি যাব
আমি একবার মাকে দেখতে যাবই দিদিমণি।

যা দেখি

শাহীন রেজা

যা দেখি, তার কতটুকু দেখা হয়?

বটের দীর্ঘ দেহ যতটুকু ছায়া ধরে ততটুকু আমার;
বাকিটা পৃথিবী তোমার থাক। তুমি সূর্যঘড়ি হয়ে
দুলতে থাকো সুমেরু থেকে কুমেরু রেখা ধরে
যতবার পারো ততবার; যেন আলোর লাটিম
ঘুরছে তো ঘুরছেই যাযাবর বালিহাঁস।

যা দেখি তা সবটুকু নয়।
এত দেখা যায় তবু আটাশ বছরেও কেমন আড়াল
ডানবুকের নিচে তোমার সেই লালমুখো তিল দুটো।
যা দেখি তা পূর্ণতার অপূর্ণ চিত্র শুধু
বাকিটুকু ঈশ্বরের চশমায়...

আমি আছি

মাহমুদ কামাল

আমি আছি, আছি-তো
যখন যেখানে থাকি, যেভাবেই থাকি
আমি আছি
হেঁটে হেঁটে যে টুকু পথ অতিক্রম করেছি
লাঠি দিয়ে ভর করে নয়-
কারো হাত ধরে নয়-
আমি দৌড়াতে পারি না ঠিক
ধরতে পারি না কোনও কেটে যাওয়া ঘুড়ি
উঁচু লাফ দিয়ে
গাছ থেকে ছিড়তে পারি না কোনও ফল
তবু আছি, মাথা তুলে আছি।

প্রতিবাস্তব কবিতা

কাজী জহিরুল ইসলাম

ভেড়াগুলো পাহাড়ে পাহাড়ে মুখ দেয় সবুজ
ছুঁড়িপাতায়
ঘচাঘচ খেয়ে ফেলে ধারালো ইস্পাত।
সমতলে বসে ওরা মেরিনেট করে
কোশের-কাফের,
স্বপ্নোত্থিত গৃহস্থের দেহের ভেতরে
ঢুকে পড়ে দূরের দরজা।

ছাতা মেলে বৃষ্টি ঘটায় দুজন
মেষবালক-মেষবালিকা
চুপি চুপি।

মধ্যস্বরে সলজ্জ দুপুর বাজে পাহাড়ের ঢালে
জংলিফুলেরা রূপপ্রবণ খোঁপায় গুঁজে নেয়
অক্ষতযোনি কুমারীদের।

মেঘেরা হাওয়া দেয়
গাছেরা দোলায় পুবের বাতাস

তুষারের ধবল খাতায় প্রাইভেট অন্ধকারে
রোজ
তরুণ কবিকে লিখে রাখে চন্দ্রাহত
প্রতিবাস্তব কবিতা।

হলিসউড, নিউ ইয়র্ক। ৩০ মে ২০১৯।

খবরা খবর

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সুদহার ২৪ শতাংশ

দেশের ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সুদের হার ২৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৪ শতাংশ করা হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা এমআরএ ৯ সেপ্টেম্বর এ ব্যাপারে এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সুদ নিতে হবে ক্রমহ্রাসমান ঋণস্থিতির ভিত্তিতে। অর্থাৎ ঋণের টাকার যে অংশ ফেরত দেওয়া হয়েছে তার ওপর আর সুদ গণনা করা যাবে না। জানা যায়, ব্যাংক খাতে সুদ হার কমানোর চাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিবেচনায় রেখেই কমানো হয়েছে সেবা মাশুল। ব্যাংকের ক্ষেত্রে যাকে সুদ বলা হয়, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাকে 'সেবা মাশুল' বলা হয়। আর এ সেবা মাশুলই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান আয়।

ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা এমআরএর বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত ৬৯৯টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ১ লাখ ৪ হাজার ৫৭৮ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। গত ডিসেম্বর '১৮ পর্যন্ত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই ঋণের সুফল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের নেতৃত্বাধীন কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের শর্ত পূরণ বিবেচনায় নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ গত মাসে এই সুদ হারে অনুমতি প্রদান করে।

দেশে ছোটো-বড়ো এনজিওর সংখ্যা কয়েক হাজার হলেও এমআরএ নিবন্ধিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬৯৯। এর মধ্যে ১০ লাখের বেশি ঋণগ্রহীতা রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠান মাত্র দুটি– ব্র্যাক ও আশা। ১ লাখ থেকে ১০ লাখ পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা থাকা প্রতিষ্ঠান 'বুরো বাংলাদেশ'সহ ২৬টি। ২৫ হাজার থেকে ১ লাখ পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা রয়েছে, এমন প্রতিষ্ঠান ৬৫টি এবং ২৫ হাজার পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠান ৬০৭টি।

বার্ষিক পরিকল্পনা সভা

গত ২৯ ও ৩০ আগস্ট বুরো বাংলাদেশের মধুপুর সিএইচআরডিতে অনুষ্ঠিত হয় সংস্থার বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা সভা। আগামী এক বছরে সংস্থার ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচীসহ বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রকল্পের লক্ষ্য নির্ধারন ও তা অর্জনে সম্ভব্য ঝুঁকিসমুহ নিয়ে এ সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। উপস্থিত ছিলেন পরিচালক অর্থ এম মোশাররফ হোসেন, পরিচালক বিশেষ কর্মসূচী সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রাণেশ বণিক ও অতিরিক্ত পরিচালক- অপারেশনস ফারমিনা হোসেন। বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা সভায় অংশগ্রহণ করেন প্রধান কার্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান, বিভাগীয় ও অঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ।

বিভাগীয় কর্মপরিকল্পনা সভা

১২ সেপ্টেম্বর থেকে বুরো বাংলাদেশ-এর ৭টি বিভাগে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সভা শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত খুলনা, পাবনা, চট্টগ্রাম এবং ঢাকা বিভাগের সভা সম্পন্ন হয়েছে। সভায় সংশ্লিষ্ট সকল অঞ্চল ও বিভাগের শাখা, এলাকা, আঞ্চলিক ও বিভাগীয় ব্যবস্থাপকগণসহ, সমন্বয়কারী-কর্মসূচী এবং অতিরিক্ত পরিচালক- অপারেশনস ফারমিনা হোসেন উপস্থিত ছিলেন। সভাগুলোতে গত অর্থ বছরের ফলাফল এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা, নতুন সদস্য সংগ্রহ, রেমিটেন্স ও সঞ্চয়সেবা পক্ষ উদযাপনসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন বিষয়ক কর্মশালা

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল) সম্প্রতি চট্টগ্রামে রুফটপ সোলার সিস্টেম বা ছাদের উপরিভাগে সোলার পদ্ধতি স্থাপনের ওপর এক কর্মশালার আয়োজন করে। চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সদস্যদের মাঝে রুফটপ সোলার প্রযুক্তিকে উৎসাহিত করাই ছিল কর্মশালার উদ্দেশ্য।

রুফটপ সোলর সিস্টেম গ্রিড বিদ্যুতের ব্যবহার কমায় এবং একই সঙ্গে বিদ্যুতের বিল কমায়। এ পদ্ধতিতে ১ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে মাত্র ১০০ বর্গফুট জায়গা এবং প্রায় ৭০ হাজার টাকা দরকার। রুফটপ সোলার থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ইউনিট ব্যয় কমে ৭ টাকার নিচে দাঁড়িয়েছে এবং ৬-৭ বছরের মধ্যে এর ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে।

পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন মো. আবদুল করিম, সাবেক মুখ্য সচিব, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সে ডা) সদস্য সিদ্দিক জোবায়ের, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিয়ার রহমান, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মাহবুবুল আলম, বুরো বাংলাদেশের পরিচালক (অর্থ) মো. মোশারফ হোসেন এবং সিডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক মো. আবদুল আউয়াল

চেক হস্তান্তর

বুরো বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের কর্মী প্রয়াত সহকারী কর্মকর্তা- কর্মসূচি সাখাওয়াত হোসেনের স্ত্রী ও সন্তানের কাছে চেক হস্তান্তর করছেন নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও হিসাব বিভাগের সমন্বয়কারী আব্দুল হালিম ও সাখাওয়াত হোসেনের বড় ভাই জাহাঙ্গীর আলম। নির্বাহী পরিচালক বুরো বাংলাদেশে দীর্ঘ কর্মজীবনে সাখাওয়াত হোসেনের অবদানের কথা স্মরণ করেন এবং তার পরিবারকে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগীতার আশ্বাস দেন। সাখাওয়াত হোসেন মৃত্যুর পূর্বে বগুড়া এলাকার 'এলাকা ব্যবস্থাপক' হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন।

ডরপ সংবাদ

রামগতিতে ঐকমত্য গঠন সভা

লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে স্বচ্ছতা, দায়িত্ববোধ, অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্কুলের ওয়াশ খাতের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঐকমত্য গঠন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালে ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দি রুরাল পুয়র-ডরপ-এর আয়োজনে উপজেলা সম্মেলনকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. শরাফ উদ্দিন আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান মো. রাহিদ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফাতেমা ফারুক, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা. মো. নাহিদ রায়হান, উপজেলা জনস্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী ফাতেমা তুজ জোহরা।

জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্পের কৌশল সংযোগ ধারণা প্রদান করেন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ডা. তারেক আলম।

সভায় সঞ্চালনা করেন ডরপ স্কুল মোবিলাইজার গুলশান সুলতানা। এতে ৩০টা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমস্যা তুলে ধরেন চর মেহার আজিজিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থী মালিহা এবং ঐকমত্য গঠন বিষয়ে বক্তব্য দেন সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক লিটন কুমার নাথ।

এ সময় উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, অভিভাবক, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, ছাত্রী, নারী কর্মী, এনজিও কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সভা শেষে স্কুলের পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন পরিস্থিতি উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ে কয়েকটি বিষয়ে সবাই একমত হয়ে স্বাক্ষর প্রদান করেন।

সবুজ পাতার স্বর্ণরেণু

মধুপুরে হতে পারে চা-বাগান

'একটি কুঁড়ি, দুটি পাতা'– ভূপেন হাজারিকার সেই বিখ্যাত গানের কলির চা-বাগান আর চা-পাতা দেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল। এ দেশের চায়ের রয়েছে বিশ্বব্যাপী চাহিদা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ-এর চা রপ্তানি হচ্ছে সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই। তৎকালীন পাকিস্তান আমলেও পাটের পরেই চা ছিল অন্যতম রপ্তানি পণ্য। একসময় সিলেট অঞ্চলে চা উৎপাদিত হলেও এখন তা ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় অঞ্চলেও বিস্তৃতি লাভ করেছে। সিলেটের চা-বাগানগুলো লাখ লাখ একর জমি জুড়ে হলেও উত্তরবঙ্গের কোনো কোনোটা আবার বেশ ছোটো আকারের। এমনকি ২০-৩০ একরের চা-বাগানও রয়েছে। ঠাকুগাঁও পঞ্চগড়ের যে জমিগুলো ফসলহীন শূন্য খাঁখাঁ বিরান, এখন সেখানেই এক কুঁড়ি দুটি পাতার অপার সৌন্দর্য খেলা করছে।

টাঙ্গাইল মধুপুর, ঘাটাইল ও সখীপুরের হলুদ টিলার জমিতে প্রচুর আনারস এবং কলা চাষ হয়। এ ধরনের জমিতে চা-বাগানও গড়ে উঠতে পারে। এক বা একাধিক ব্যক্তি মিলিতভাবে ১০/১৫ একর জমিতে চা চাষ করতে পারেন। নতুন চা-বাগান, নতুন চা-পাতা, চা-বাগানের নতুন নারী শ্রমিক বদলে দিতে পারে আমাদের অর্থনীতি। মধুপুর বেল্ট হতে পারে নান্দনিক চা-বাগানের দর্শনীয় স্থান।

বুরো ক্রাফট-এর পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হলেন বিশিষ্ট উদ্যোক্তা রাহেলা জাকির

বুরো বাংলাদেশের নতুন প্রকল্প বুরো ক্রাফট-এর পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিশিষ্ট উদ্যোক্তা রাহেলা জাকির। তিনি আনারস পাতা ও কলাগাছের বাকল থেকে উৎপন্ন প্রাকৃতিক আঁশ ভিত্তিক প্রকল্প বুরো ক্রাফটের সার্বিক বিষয় তত্ত্বাবধান করবেন। পরিচালক- বুরো ক্রাফট হিসেবে রাহেলা জাকিরের এই নিয়োগ আগামী ১লা অক্টোবর ২০১৯ থেকে কার্যকর হবে।

এমএফআই স্টাফ ইনফরমেশন ব্যুরো'র কার্যক্রম শুরু

ক্ষুদ্রঅর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে (এমএফআই) যুগপোযোগী মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যোগ্য কর্মী নির্বাচন ও মাঠ পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান খেলাপী নিয়ন্ত্রণে ২০১৮ সালে ইনাফি বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে স্টাফ ইনফরমেশন ব্যুরো (এসবিআই) গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়ছিল। ব্র্যাক, বুরো বাংলাদেশ, পপি, কোস্ট ট্রাস্ট, এসএকএস ফাউন্ডেশন, শক্তি ফাউন্ডেশন, ঘাসফুল, টিএমএসএস ও পিবিকে প্রাথমিক পর্যায়েই এই উদ্যোগের অংশীদারিত্ব গ্রহণ করে এবং এসএসএস ও আশ্রয় পরবর্তীতে যুক্ত হওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। সম্প্রতি ওয়েব ভিত্তিক এই তথ্য ব্যুরোর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়েছে। এসবিআই-এর অংশীদার সংস্থাসমুহ এখন থেকে এই তথ্যভান্ডার ব্যবহার করতে পারবে। স্টাফ ইনফরমেশন ব্যুরোর সঠিক ব্যবহার করতে সক্ষম হলে দক্ষ ও যোগ্য কর্মী নিয়োগ দিয়ে শুধুমাত্র এমএফআইগুলোই উপকৃত হবে না, বরং বিদ্যমান ও নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের কর্মদক্ষতা ও স্বচ্ছতার উপরেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হয়।

অডিট কমিটির সভা

গত ৮ সেপ্টেম্বর বুরো বাংলাদেশের অডিট কমিটির সভা প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন অডিট কমিটির সভাপতি ড. নূরুল আমিন খান, সদস্য ড. এম এ ইউসুফ খান ও সৈয়দ সাহাদত হোসেন পিটু। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন পরিচালক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রাণেশ বণিক, অতিরিক্ত পরিচালক- অপারেশনস ফারমিনা হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধানগণ।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ যথাযথ মর্যাদায় বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়সহ সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে পালিত হয়েছে। জাতীয় শোক দিবস পালনের অংশ হিসেবে রাজধানীর গুলশানস্থ প্রধান কার্যালয়, ৭টি বিভাগীয় ও ২৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে ব্যানার প্রদর্শন করা হয়। বুরো বাংলাদেশের কর্মীরা এদিন কালো ব্যাজ ধারণ করেন।

প্যানাসনিক প্রতিনিধির সাথে বুরোর বৈঠক

এয়ারকুলার প্রস্তুতকারী বহুজাতিক কোম্পানি প্যানাসনিক-এর গ্লোবাল মার্কেটিং অফিসার ইজি মোরি এবং দক্ষিণ এশিয়ার ডিজিএম, সেলস এন্ড মার্কেটিং ভূপেন্দ্র ভার্দওয়াজ গত ৯ সেপ্টেম্বর বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ে ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে বুরো বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক অর্থ এম মোশাররফ হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক- অপারেশনস ফারমিনা হোসেন এবং অবকাঠামো উন্নয়ন প্রধান মুকিতুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট আরো অনেকে।

শোক সংবাদ

চাঁদপুর অঞ্চলের ফরিদগঞ্জ এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা ব্যবস্থাপক মোঃ রেজাউল করিম গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে চাঁদপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ শেষে নিজ কর্মস্থলে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত হন। তাকে স্থানীয় লোকজন নিকটস্থ চাঁদপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক আনুমানিক রাত ৮:৪৫ মিনিটে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। রেজাউল করিম স্ত্রীসহ এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার অকাল মৃত্যুতে বুরো পরিবারের প্রতিটি কর্মী মর্মাহত।

বুরো পরিবার মোঃ রেজাউল করিম -এর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

নিলুফুন নাহার চৌধুরী
কর্মকর্তা -মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বুরো বাংলাদেশের পঞ্চগড়, রাজবাড়ী, নড়াইল ও বগুড়া শাখার আয়োজনে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওয়াটার ডট অর্গ-এর আর্থায়নের পরিচালিত বুরো বাংলাদেশের এ সংক্রান্ত ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে নিরাপদ পানির সংস্থান ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনে ঋণ সহায়তা প্রদান করা। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সাবিনা ইয়াসমিন, জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়; জনাব দিলসাদ বেগম, জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী; জনাব আনজুমান আরা, জেলা প্রশাসক, নড়াইল এবং জনাব ফয়েজ আহাম্মদ, জেলা প্রশাসক, বগুড়া। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই প্রধান অতিথিগণ নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া পঞ্চগড়ের সহকারী কমিশনার- ভূমি জনাব মো. মেহেদি হাসান, রাজবাড়ীর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মো. ইমদাদুল হক বিশ্বাস, নড়াইলের জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব সালমা রহমান কবিতা, রাজবাড়ীর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো. সাইদুজ্জামান খাঁন সহ বুরো বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত ছিলেন।

ইনাফি বাংলাদেশ-এর বার্ষিক সাধারণ সভা

ইনাফি বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন-এর ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রাজধানীর মহাখালিস্থ ব্র্যাক সেন্টার ইন-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংস্থাটির সাধারণ পরিষদের ২৪ জন সদস্য এই সভায় অংশগ্রহণ করেন।

এফএনবি'র সাংগঠনিক সাব-কমিটির সভা

২৭ আগস্ট ২০১৯ বিকেলে এনজিও সংস্থা ডরপ-এর সভাকক্ষে এনজিও ফেডারেশন (এফএনবি)'র সাংগঠনিক সাব কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাব কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন এফএনবি'র ভাইস-চেয়ার ও বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন এফএনবি'র চেয়ার জনাব এসএন কৈরী, এফএনবি'র পরিচালক জনাব মো. রফিকুল ইসলামসহ সদস্য এ এইচ এম নোমান, মো: আব্দুল আউয়াল ও মজিবুর রহমান। সভায় এফএনবি'র সেন্ট্রাল কাউন্সিলে রোটেটিং সদস্য (২০২০-২২) মনোনয়ন, নির্বাচন কমিশনার মনোনয়ন, বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৯ ও নির্বাচনসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

নুরজাহানের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

কাজল সরকার

নুরজাহান একজন সফল নারী উদ্যোক্তা। যিনি ২০১০ সালে বাড়ি বাড়ি কাপড় বিক্রি করতেন এবং তাঁর স্বামী একটি স-মিলে কর্মচারী ছিলেন। আর তাঁদের এই সামান্য রোজগাড়েই তিন ছেলে নিয়ে তাঁদের সংসার চলতো। তিন ছেলের লেখাপড়ার খরচ, পাঁচ জনের খাবার খরচ সবকিছু মিলিয়ে বেশ কষ্টে জীবিকা চলছিল তাঁদের। নুরজাহানের এই কষ্টের সংসারে হঠাৎই নেমে আসে বিপদের কালো মেঘ। চাকরি ছেড়ে দেন নুরজাহানের স্বামী, দিশেহারা হয়ে যান নুরজাহান। কীভাবে কী করবেন, সংসার কীভাবে চলবে ভেবে কোনো কিনারা খুঁজে পান না তিনি।

আর ঠিক এমন সময়ই তাঁর এক প্রতিবেশী তাকে যে-কোনো একটি এনজিওতে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন। নুরজাহান তাঁর প্রতিবেশীর কথা শুনে বিভিন্ন এনজিও সম্পর্কে খোঁজ নিতে থাকেন। আর এভাবেই খোঁজ পান বুরো বাংলাদেশের। বুরো বাংলাদেশের সঞ্চয় ও ঋণের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে জেনে নুরজাহান ভর্তি হন বুরো বাংলাদেশের কোটবাড়ি শাখার ৩০ নম্বর কেন্দ্রে আর এখান থেকেই শুরু হয় নুরজাহান আর বুরো বাংলাদেশের একসঙ্গে পথ চলা।

বুরো বাংলাদেশে ভর্তি হবার পর নুরজাহান ১ম দফায় ঋণ নেন ১০ হাজার টাকা। এই ঋণের টাকা দিয়ে নুরজাহান তাঁর বাড়ির সামনে একটি দোকান দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। দোকানে পণ্য হিসেবে রাখেন কাপড় এবং কাঠের ফার্নিচার। যেহেতু তাদের স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই পণ্য দুটি সম্পর্কে পূর্বধারণা ছিল তাই তারা এই ব্যবসায় সফলতা পান খুব দ্রুত। আর ধীরে ধীরে তাঁদের দারিদ্র্য ঘুচতে শুরু করে, তাঁর সংসার সচ্ছল হতে শুরু করে। এরপর অবস্থার আরো উন্নয়নের জন্য নুরজাহান ২য় দফায় বুরো বাংলাদেশ থেকে ঋণ নেন ৫০ হাজার টাকা। এই ঋণের টাকা এবং ব্যবসার লাভের টাকা মিলিয়ে শুরু করেন স-মিলের ব্যবসা এবং এই ব্যবসা থেকেই শুরু হয় নুরজাহানের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। এরপর ধীরে ধীরে তাঁদের ব্যবসা বাড়তে থাকে এবং তারা বাড়ির পাশের জায়গা ছেড়ে বাড়ি থেকে একটু দূরে প্রায় ২০ শতাংশ জায়গা পাঁচ বছরের জন্য লিজ নেন। এরপর তারা ওই জায়গাতে শুরু করেন তাদের স-মিলের ব্যবসা। প্রথমদিকে নুরজাহান ও তার স্বামী মিলেই স-মিল চালাতেন। এরপর ধীরে ধীরে তাঁরা কাজের গতি বাড়ানোর জন্য কর্মী নিতে থাকেন। বর্তমানে তার স-মিলে ৩০ জন কর্মী কাজ করে। এই কর্মীদের খাবার রান্না করেন নুরজাহান নিজেই।

৫০ হাজার টাকা ঋণের পর পর্যায়ক্রমে নুরজাহান বুরো বাংলাদেশ থেকে ১ লাখ, ২ লাখ, ৩ লাখ, ৫ লাখ এবং সর্বশেষ ৬ লাখ টাকার ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং খুব ভালোভাবে এই ঋণ চালাচ্ছেন।

বর্তমানে তাঁদের নিট মাসিক আয় ২ লাখ টাকা। নুরজাহান তাঁর মেজো ছেলেকে পাঠিয়েছেন বিদেশ এবং বড় ছেলে আলাদা স-মিলের ব্যবসা করেন। নুরজাহানের স্বপ্ন তাঁর ব্যবসা আরো বড় হবে এবং তার স-মিলে সৃষ্টি হবে আরো মানুষের কর্মসংস্থান।

• **লেখক**, *প্রশিক্ষক*, মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, কুমিল্লা

অদম্য আমেনার বেকারি ব্যবসা

সঞ্জয় কুমার কর্মকার

আমেনা বেগমের সাফল্যের গল্পটি একটু অন্যরকম। ব্রহ্মণবাড়ীয়া জেলার বাঞ্ছারাম পুরের একটি ছোট্ট গ্রামের মেয়ে আমেনা। দরিদ্র কৃষক পিতার পাঁচ সন্তানের মধ্যে আমেনা ছিলেন সব থেকে ছোট। আমেনার বাবার পক্ষে পাঁচ সন্তানসহ স্ত্রী ও বৃদ্ধ বাবা-মাকে নিয়ে বিশাল পরিবার পরিচালনা করা ছিল খুবই কষ্টকর ব্যাপার। তাই ১৪ বছর বয়সেই তাকে বসতে হয়েছিল বিয়ের পিঁড়িতে। খুব বেশি দূরে নয়, পাশের গ্রাম উজানচড়ের বাসিন্দা মো. আমিরুল এর সঙ্গে। আমিরুল ছিলেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তিনি তার গ্রাম ও পাশের গ্রামের বিভিন্ন হাটবাজার ও মেলাতে নিমকি, কদমা, ফুলকি ও কটকটি বিক্রি করতেন এবং সেই আয় দিয়েই সংসার চালাতেন। শ্বশুরবাড়িতেও আমেনা তার বাবার বাড়ির মতো অনেক বড় একটা পরিবার পেলেন। সেই সঙ্গে একই দারিদ্র দেখতে পেলেন স্বামীর সংসারেও। এখানে তাঁর বৃদ্ধ শ্বশুর অসুস্থতার কারণে বাড়িতে বসে থাকতেন। দুই দেবর ও দুই ননদ ছিলেন ছোট। সবার ভরণপোষণের দায়িত্ব ছিল তার স্বামী আমিরুলের ওপর। কিন্তু এভাবে আর চলছিল না আমেনার সংসার। প্রতিরাতে আমেনার স্বামী ও তার শাশুড়ি নিমকি ও কদমা বানাতেন। সকাল হতেই সেগুলো নিয়ে বিক্রি করার ব্যবস্থা করতেন তাঁর স্বামী। মেলার সময় স্বামী ও শাশুড়ির সঙ্গে আমেনাকেও নিমকি বনানোর কাজে সহযোগিতা করতে হতো। এভাবে চলতে থাকল কিছুদিন। হঠাৎ তার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়াতে নিমকি ও কদমা বিভিন্ন দোকান ও বাজারে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ঘটলো বিপত্তি। তখন আমেনা তাঁর শাশুড়ির সঙ্গেই নিমকিগুলো বিভিন্ন দোকানে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু এইভাবে পরিবারের আয় দিন দিন কমতে থাকল। নানান চিন্তায় কোনো উপায় ভেবে পাচ্ছিলেন না আমেনা ও তার পরিবার। হঠাৎ একদিন পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাজার থেকে এক বড় ব্যবসায়ী তার নতুন দোকান উদ্বোধন করার জন্য নিমকির জন্য অর্ডার দিতে লোক পাঠালেন, যার পরিমাণ ছিল অনেক। একদিকে স্বামী অসুস্থ অন্যদিকে এত পরিমাণ নিমকি বানানোর জন্য পরিমিত কাঁচামাল কেনার টাকাও ছিল না। এ এক বিরাট সুযোগ আমেনার জন্য কিন্তু কীভাবে টাকা সংগ্রহ করা যায় এ নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি। পরে টাকার অভাকে সেই অর্ডার নেওয়া সম্ভব হয়নি আমেনার। তখন থেকেই আমেনার মাথায় শুধু একটাই চিন্তা, পরিবারের আয় যদি বাড়াতে চাই তাহলে এইরকম বড় বড় অর্ডার সংগ্রহ করতে হবে আর এর জন্য দরকার টাকার। ব্যাংক থেকে ঋণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। একদিন বাজার থেকে ফেরার পথে বুরো বাংলাদেশের শাখা নজরে পড়ল আমেনার। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, বুরো বাংলাদেশ থেকেও খুব সহজ শর্তে ঋণ নেওয়া যায়। পরবর্তীতে আমেনা নিজে বুরো বাংলাদেশের হোমনা শাখাতে সদস্য হিসেবে ভর্তি হলেন। ভর্তি হয়ে প্রথমেই ঋণ পেলেন ৩০ হাজার টাকা, যার পুরোটাই তার নিমকি ব্যবসাতে কাজে লাগালেন। এরপর থেকে তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। বর্তমানে তার নিমকি ব্যবসা সমৃদ্ধ হয়ে পরিণত হয়েছে বেকারি ব্যবসায়। সেই কবে ৩০ হাজার টাকা বুরো বাংলাদেশে থেকে ঋণ গ্রহণ করে এখন তিনি ২ লাখ ৫০ হাজার টাকার একজন সফল গ্রাহক। পাশাপাশি বুরো বাংলাদেশ সঞ্চয় করছেন আয়ের বাড়তি অংশ। এই বেকারি ব্যবসা আমেনা এখন নিজেই দেখাশোনা করেন এবং পণ্য তৈরির জন্য বেশ কয়েকজন লোকও লাগিয়েছেন। এখন আমেনার সেই ছোট্ট বাড়িতে উঠেছে দোতলা দালান এবং তার পাঁচ সন্তানের মধ্যে তিন মেয়েকে দিয়েছেন ভালো ঘরে বিয়ে, এক মেয়ে ৮ম শ্রেণিতে পড়ছে। একমাত্র ছেলেকে পাঠিয়েছেন বিদেশে। বর্তমানে আমেনা বেগম একজন সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী। তাঁর সফলতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে উজানচড় গ্রামে অনেকেই এখন নিমকি ব্যবসা পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

• **লেখক**, প্রশিক্ষক, মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, কুমিল্লা

প্রশিক্ষণ-কনফারেন্স-আবাসন-এর নিরাপদ সুবিধা

বুরো বাংলাদেশ-এর সিএইচআরডি– মধুপুর

টাঙ্গাইল জেলার মোহনীয় বনাঞ্চল মধুপুরে কাজে কিংবা পর্যটক হিসেবে ঘুরতে এসেছেন? যে কারণেই আসুন না কেন, স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ আহার ও রাত্রি যাপনের জন্যে ভালো মানের নিরাপদ আশ্রয় হতে পারে বুরো বাংলাদেশের নান্দনিক স্থাপনা সিএইচআরডি মধুপুর। ভবনের সামনে মনকাড়া লেক, আকর্ষণীয় সিঁড়ি, মনোরম বাগান ও সবুজের লাস্যময়তা।

আপনার ও আপনার সফরসঙ্গীদের জন্য শুধু এসি/নন এসি, ডাবল/সিঙ্গেল রুমই নয়, আছে এসি ডাইনিং, সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ, ওয়াই-ফাই, ২৪ ঘণ্টা রুম সার্ভিস, ব্যায়ামাগার, গাড়ি পার্কিং, সনা বাথ, স্টিম বাথ, ২৪ ঘণ্টা নিজস্ব নিরাপত্তা।

সরকারি-সেরকারি প্রতিষ্ঠানের এজিএম, সমন্বয় সভা, আবাসিক ট্রেনিং, বিজনেস মিটিং, কর্মশালা, করপোরেট সভা, ব্যাংক-বিমা প্রতিষ্ঠানের মিটিং, কন্‌ফারেন্স, সেমিনার, ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, বার্ষিক সম্মেলন করতে চাচ্ছেন? ঢাকার বাইরে ইতিহাস ঐতিহ্যখ্যাত মধুপুরের আরণ্যক পরিবেশে? শুরুতেই চিন্তা করছেন কোথায় পাবেন আধুনিক ব্যবস্থাপনায় আয়োজনের স্থান? দুশ্চিন্তার কিছু নেই। বুরো বাংলাদেশের সিএইচআরডি– মধুপুরে রয়েছে সুসজ্জিত বিশাল এসি-মাল্টিমিডিয়া কনফারেন্স রুম, আছে কম্পিউটার ল্যাব। আপনি নিশ্চিন্তভাবে আয়োজনের সব ব্যবস্থা ছেড়ে দিতে পারেন বুরো বাংলাদেশ-এর ওপর। এখানে সব কাজই হয় দ্রুত ও মানসম্মতভাবে। আয়োজনের জন্য বুরো বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা যেমন আধুনিক, তেমনি নিরাপদ। আমাদের রয়েছে একসঙ্গে ৩০ থেকে ১২০ জনের জন্য আবাসিক/অনাবাসিক ট্রেনিং এর যাবতীয় ব্যবস্থা। এর মধ্যে রয়েছে একটি সুবিশাল হল রুম, এসি-সুইট ৪টি, এসি কাপলবেড ৫টি রুম, এসি ডিলাক্স টুইনবেড ৮টি রুম, ২ বেডের এসি রুম ৭টি, ৩ বেডের এসি রুম ৮টি, ২ বেডের ননএসি রুম ৮টি, ৩ বেডের ননএসি রুম ৫টি, ৪ বেডের ননএসি রুম ৫টি। মোট ৫০টি রুমে ১১৪ জনের থাকার সুযোগ। আরো রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে সুদক্ষ শেফ-এর হাতে তৈরি চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন মানের সুস্বাদু খাবার।

করপোরেট কিংবা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে যারাই আমাদের কাছে আসবেন, আপনাদের জন্য আমাদের সেবা অগ্রগণ্য। স্থান হিসেবে মধুপুর সত্যিই আকর্ষণীয়। এখানে রয়েছে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী মঙ্গোলীয় অভিযাত্রিক, গারো, বংশী, মান্দাই ও কোচদের আবাসভূমি। যখন মধুপুর বনাঞ্চল ছিল দুর্ভেদ্য জঙ্গল, তখন থেকেই এসব সাহসী নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী হিংস্র বন্য প্রাণী, যেমন : বাঘ, ভালুক, মেছো বাঘ, বিষধর সাপের সঙ্গে বসবাসে অভ্যস্ত ছিল। মধুপুর থেকে ময়মনসিংহ যেতে ১০ কিলোমিটার ঘন বনের ভেতর দিয়ে যাত্রার অনুভূতির আনন্দও কিন্তু কম নয়। এ স্থানের ঐতিহাসিক মূল্যও অনেক। ব্রিটিশবিরোধী সন্ন্যাস বিদ্রোহীরা এ জঙ্গলেই সংগঠিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' উপন্যাসের আনন্দ মঠের ভগ্নাবশেষ এখানে বিদ্যমান।

মূর্তিপূজারি এসব নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর এক বিশাল অংশ খ্রিষ্টান যাজকদের সান্নিধ্যে এসে খ্রিষ্টান হয়েছে। তাদের পল্লিতে গিয়ে ঘুরে আসতে পারেন অনায়াসে। জানতে পারেন তাদের জীবনযাত্রা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি সম্পর্কে। জলছত্রে রয়েছে আধুনিক হাসপাতাল। চাইলে তাদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাও উপভোগ করতে পারেন। তাদের স্বহস্তে তৈরি ঐতিহ্যবাহী পোশাক ক্রয়েরও সুযোগ আছে। কাছেই আছে লহুরিয়া ওয়াচ টাওয়ার, চিড়িয়াখানা ও রাবার বাগান।

মধুপুর গজারী অরণ্যে হারিয়ে গিয়ে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে শুনতে পারেন বনমুরগির উচ্ছ্বসিত ডাক। দেখতে পারেন গায়ে কাঁটা জড়ানো শজারুর দ্রুত ছুটে যাওয়া। দেখতে পারেন শাখামৃগ ও কাঠবিড়ালি কী দারুণ লাফালাফি করে আপনার আগমনকে জানাচ্ছে সাদর অভিবাদন! সত্যি, কাজ করতে এসে নিসর্গের এই বাঙময় রূপ সান্নিধ্য আপনার কাজের গতিকে বাড়িয়ে দেবে শতগুণ।

মধুপুর শহর থেকে তিন কিলোমিটার পূর্বে ময়মনসিংহ সড়ক সংশ্লিষ্ট কাকরাইদ এর আকালিয়াবাড়ী বুরো বাংলাদেশ-এর মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র (সিএইচআরডি) মধুপুর এর নান্দনিক ভবন আপনার অফিসিয়াল কিংবা ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে নিরাপদ বেষ্টনীতে রাখার সুযোগ দিতে ইচ্ছুক।

যোগাযোগ করুন : ব্যবস্থাপক, সিএইচআরডি
ফোন: ০১৭০১২৫০১১৪
ইমেইল : chrd_modhupur@burobd.org

শাহীনা বেগম

কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার মধ্যমতলা গ্রামের বাসিন্দা। বুরো বাংলাদেশ-এর নিমসার শাখার ৫৩ নম্বর কেন্দ্রের সদস্য। বুরো বাংলাদেশ-এর সাথে তার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। বহুবার ঋণ নিয়েছেন। ঋণের টাকায় ফসল আবাদ করেন। এবার বিস্তৃত জমিতে শবজি চাষ করেছেন। লাউ-কুমড়ায় ভরে গেছে তার জাংলা। আমরা যখন পৌঁছি, তিনি তখন ফসল তুলছিলেন। আমাদের দেখে দুটো কালি-কুমড়ো হাতে নিয়ে মুখভরা হাসি দিলেন। এ হাসি শুধু তার মুখের নয়, হৃদয়েরও। বুরো'র সহায়তায় আজ তিনি সাবলম্বী, স্বচ্ছল। শাহীনা বেগমের এই হাসি ছড়িয়ে পড়ুক বাংলার হাজারো নারীর মুখে।

প্রত্যয়
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯ ● সংখ্যা-১৯ ● বর্ষ-৫

নিয়মিত সঞ্চয়, নিরাপদ ভবিষ্যত

বুরো বাংলাদেশ

গ্রাহক সংগ্রহ, রেমিটেন্স ও

সঞ্চয় সপ্তাহ ২০১৯

১০-২৪ নভেম্বর

BURO
Bangladesh